ভাবীকালের একটি গল্প

এইচ জি ওয়েলস

সূচিপত্র

প্রেমরোগ সারানোর দাওয়াই....2

বিজন শহরতলি....27

শহরের জীবন....46

পাতাল-জীবন....54

বিনডনের হস্তক্ষেপ....56

প্রেমরোগ সারানোর দাওয়াই

মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলের খাঁটি ইংরেজ মি. মরিস অতিশয় সজ্জন পুরুষ। সচ্ছল অবস্থা। টাইমস দৈনিক পড়েন রোজ। ফি-হপ্তায় গির্জায় যান। দুপায়ে যারা দাঁড়াতে পারেনি, তাদেরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। নিয়মমতো চুল কাটেন। দানধ্যান করেন। জামাকাপড়ও পরিচ্ছন্ন। স্মার্ট। তৃপ্ত। সুখী। আদর্শ পুরুষ।

একটি বউ-ছেলেমেয়েও আছে। বেশি নয়, কমও নয়। সুশিক্ষা দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের –যার যা দরকার, সবই দিয়েছেন। যা সংগত, যা ন্যায্য, মি. মরিসের জীবনে তার কোনওটিরই ঘাটতি নেই। মাঝবয়সে একদিন মারাও গেলেন ভদ্রলোক। কবরস্থ হলেন। মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত হল তাঁর জমকালো স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিফলকে উত্তীর্ণ বাড়াবাড়ি কিছু রইল না, অর্থহীনও কিছু রইল না।

এই গল্প শুরু হওয়ার অনেক আগেই ধুলো হয়ে গেল তাঁর দেহাস্থি–উড়িয়ে দেওয়া হল হাওয়ায়। শুধু তাঁর নয়, তাঁর নাতিপুতিদের হাড়ের ধুলোরও অবস্থাটা দাঁড়াল একই রকম। মি. মরিস কিন্তু কল্পনাও করতে পারেননি, এমন কাণ্ড ঘটতে পারে। জীবদ্দশায় কেউ তাঁকে এই ধরনের সম্ভাবনার কথা বললে দুঃখ পেতেন। মানুষ জাতটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁরা নির্বিকার, তিনি তাঁদেরই একজন। মি. মরিস অবশ্য আর-এক কাঠি সরেস এ ব্যাপারে। ওঁর মৃত্যুর পর মানবজাতির আদৌ কোনও ভবিষ্যৎ থাকবে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ ছিল তাঁর।

কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে মানুষ জাতটা টিকে রইল তাঁর এবং নাতিপুতিদের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার পরেও। ভদ্রলোকের নয়নসুন্দর স্মৃতিসৌধের মার্বেল পুড়িয়ে বাড়ি তৈরির উপাদানও তৈরি হয়ে গেল। দুনিয়া এগিয়ে চলল আগের মতোই।

আর-একটা ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী শুনলে রেগে যেতেন মি. মরিস। পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়া অগুনতি মানুষের রক্তে মিশে গিয়েছিল তাঁরও ধমনির রক্ত। হাজার হাজার পরদেশির রক্তে ঠাঁই নিয়েছিল তাঁর খাঁটি ইংরেজ রক্ত।

এই একই পরিণতি ঘটবে এ কাহিনি যাঁরা পড়ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও। যে জীবনে তাঁরা অভ্যস্ত, দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে সেই জীবন–হাজারখানেক পরদেশি ছাপ পড়বে সেই জীবনে–উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না–কল্পনাও করা যাবে না।

মি. মরিসের বংশধরদের মধ্যে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর পূর্বপুরুষের মতোই প্রায় সুস্থমস্তিষ্ক এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। সেইরকমই খর্বকায় বলিষ্ঠ আকৃতি। নামটিও তা-ই –তবে উচ্চারণটা অন্যরকম–মরিস হয়ে গিয়েছে স্বরেস। মুখের ভাবেও সেই একই রকম ফিকে অবজ্ঞা। অবস্থা সচ্ছল। সমকালীন তরুণ তুর্কিদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না। মরিসের মতো ভবিষ্যৎ এবং নিম্নশ্রেণির ব্যক্তি সম্বন্ধে একই মনোভাব পোষণ করেন। টাইমস বলে যে একটা দৈনিক পত্রিকা ছিল, সে খবরও রাখেন না। মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে টাইমস। ওঁকে খবর শুনিয়ে যায় ফোনোগ্রাফ মেশিন। প্রাতঃকর্ম সারবার সময়ে বকবক করে বিশ্বের খবর বলে যায় আশ্চর্য এই যন্ত্র। আকার-আয়তনে ডাচ ঘড়ির মতো। সামনের দিকে আছে বিদ্যুৎচালিত আবহাওয়া নির্দেশক ব্যারোমিটার,

বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি আর একটা ক্যালেন্ডার। সারাদিনে কার কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তা মনে করিয়ে দেওয়ার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও আছে ফোনোগ্রাফের সামনে। ঘড়ির মুখটা তুরীর মতো ফাঁদালো। খবর শুরু হলেই গাঁকগাঁক আওয়াজ বেরিয়ে আসে তূরীর চোঙা দিয়ে। উড়ুক্কু বাস সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে বলেই দুর্ঘটনা ঘটে আকছার–রাতে কোথায় কটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটেছে, সে খবর পরিবেশন করে ফোনোগ্রাফ; তিব্বতে নতুন কী ফ্যাশনের আমদানি ঘটল, তা-ও জানা হয়ে যায়। জামাকাপড় পরার সময়ে শুনতে পান একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোথায় কী মিটিং হয়ে গেল গতকাল। খবর ভালো না লাগলে, শুধু একটা বোতাম ছুঁয়ে দেন স্বরেস। যেন দম আটকে আসে ফোনোগ্রাফের–খাবি খেতে খেতে শুরু করে অন্য খবর।

স্বরেস সাহেবের প্রাতঃকর্ম অবশ্য তাঁর পূর্বপুরুষের মতো নয় মোটেই। পুরাকালের মরিস দেখলে আহত হতেন। বুক চৌচির হয়ে যেত আদ্যিকালের মরিসের জামাকাপড়ের ছিরি দেখলে। ছি ছি ছি! স্বরেস সাহেব ন্যাংটা হয়ে দুনিয়া চরকি দিয়ে আসবেন তবুও ভালো, কিন্তু প্রাচীনকালের মরিস সাহেবের মতো সিল্কের টুপি, ফ্রককোট, ধূসর ট্রাউজারস আর ঘড়ির চেন গায়ে চাপিয়ে সং সাজতে রাজি নন কোনওমতেই। দাড়ি কামানোর হাঙ্গামার মধ্যেও মরতে মলেও যান না স্বরেস সাহেব। ও আদি অভ্যাস এ যুগে কি মানায়? নিপুণ কারিগর অনেকদিন আগেই গাল থেকে প্রতিটা চুলের গোড়া পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। দাড়ি এক্কেবারে নির্মূল মৃত্যু পর্যন্ত। কামানোর ঝাটও নেই। পদযুগলকে ঢেকে রাখবার জন্যে ট্রাউজারস নামক বিদঘুটে পোশাকই বা পরতে যাবেন কেন? পরেন গোলাপি আর অম্বর রঙের এয়ার-টাইট বস্তুনির্মিত পোশাক–দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। পা দুখানা যে লিকলিকে সরু নয় রীতিমতো পেশিবহুল তা বোঝানোর কায়দাটা দারুণ অভিনব। পাম্প লাগানো আছে পোশাকের মধ্যে। বাতাস ঢুকিয়ে

ট্রাউজারস ফুলিয়ে দেন। দেখলেই মনে হয় যেন থাকে থাকে মাস্ল সাজানো রয়েছে পুষ্ট পদযুগলে। কোথায় লাগে হারকিউলিসের পেশি! এর ওপর চাপানো বাতাস ভরতি ধরাচুড়া–সবার ওপর অবশ্য থাকে অম্বর সিল্কের টিউনিক–যা রোম দেশের মানুষরা পরত। ফলে, হঠাৎ প্রচণ্ড গরম বা নিদারুণ ঠান্ডায় কষ্ট পেতে হয় না। সবকিছুর ওপর পরেন টকটকে লাল রঙের একটা আলখাল্লা–কিনারাগুলো অত্যাশ্চর্যভাবে বাঁকানো। মাথার টুপিটা বাস্তবিকই অদ্ভুতদর্শন–মোরগের ঝুঁটির মতো। অদ্ভুত হলেও দেখতে ভারী সুন্দর। টকটকে লাল রং। মাথায় সেঁটে থাকে বাতাসের শোষণ-টানে। টুপি ফুলে থাকে হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরতি থাকায়। ও হ্যাঁ, স্বরেস সাহেবের মাথায় কিন্তু চুলের বালাই নেই। নাপিত নামক চুলের কারিগর প্রতিটা কেশ সমূলে উৎপাটন করেছে বহু বছর আগে। ফলে, টুপি ঠিকরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। রোজ সকালে এহেন পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে প্রশান্ত চোখে স্বরেস সাহেব বেরিয়ে পড়েন সমকালের মানুষদের সামনে।

স্বরেসকে মি. স্বরেস বলার কাষ্ঠ সৌজন্য লোপ পেয়েছে বহু বছর আগেই। স্বরেস এখন। শুধুই স্বরেসমিস্টার-ফিস্টারের বালাই নেই। ভদ্রলোক উইন্ডভেন অ্যান্ড ওয়াটারফল ট্রাস্ট কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কোম্পানিটা বিরাট। এই পৃথিবীতে যাঁর যত বিদ্যুৎশক্তি দরকার, সবই জোগান দিচ্ছে এই কোম্পানি। দুনিয়ার সমস্ত জলচক্র আর জলপ্রপাতের মালিক এই একটা কোম্পানি। ফলে, পৃথিবী গ্রহটার জল পাম্প করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করার অধিকার রয়েছে কেবল এই কোম্পানিরই। ভদ্রলোক থাকেন লন্ডনের সেভেন্থ ওয়ে অঞ্চলের একটা পেল্লায় হোটেলে-সতেরোতলার একটা অতীব আরামপ্রদ এবং সুবিশাল ফ্লাটে। ভিক্টোরীয় আমলের বাবুগিরির ইতি হয়ে গেছে। অনেককাল আগেই–ঝি-চাকর-খানসামা রেখে নবাবি চালে থাকার সাধ থাকলেও

সাধ্য হয় না কারওই। বাড়ি ভাড়া আর জমির দাম যে হারে বেড়েছে এবং ঝি-চাকরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাবান্নার যান্ত্রিক ব্যবস্থার এমন উন্নতি ঘটেছে যে, আলাদা বাড়িতে পৃথক ঘরকন্না করার রেওয়াজও লোপ পেয়েছে। দলছাড়া হয়ে থাকা এ যুগে বর্বর বিলাসিতার শামিল। এহেন অ্যাপার্টমেন্টে সাজগোজ শেষ করে স্বরেস গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা দরজার সামনে। দুটো দরজা আছে অ্যাপার্টমেন্টে–এক-এক প্রান্তে একটা। প্রত্যেক দরজার ওপর বিশাল তির চিহ্ন-নিশানা করছে বিপরীত দরজার দিকে। বোতাম ছুতেই খুলে গেল দরজা। চওড়া গলিপথে এসে দাঁড়ালেন স্বরেস সাহেব। গলিপথের ঠিক মাঝখানে সারি সারি চেয়ার পাতা রয়েছে–ধীরস্থির গতিবেগে চেয়ার সরে যাচ্ছে বাঁদিকে। ঝলমলে পোশাক-পরা নরনারী বসে কয়েকটি চেয়ারে। পরিচিত একজনকে অভিবাদন জানালেন বাতাসে মাথা ঠুকে। কথা বললেন না। এ যুগে প্রাতরাশ খাওয়ার আগে কথা বলাটা শিষ্টাচার নয় মোটেই। টুপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। চলন্ত চেয়ার গিয়ে দাঁড়াল লিফটের সামনে। লিফটে করে নেমে গেলেন বিশাল হলঘরে। বসে রইলেন। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রাতরাশ পরিবেশনের প্রতীক্ষায়।

ভিক্টোরীয় যুগে যে ধরনের প্রাতরাশ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল–এ প্রাতরাশ কিন্তু সে প্রাতরাশ নয়। এক ধ্যাবড়া ময়দার তাল থেঁতলে চটকে বেঁকিয়ে সেঁকে পশুচর্বি মাখিয়ে সুস্বাদু করা হত তখন। সেই সঙ্গে থাকত সদ্যনিহত পশুমাংস–যা দেখলেই চেনা যেত কোন পশুর মাংস। কদাকারভাবে ঝলসিয়ে নির্মমভাবে কেটেও টুকরো টুকরো চেহারা পালটানো যেত না। নিষ্ঠুরভাবে ডিম কেড়ে আনা হত মুরগির বাসা থেকে, মুরগি বেচারির কোঁকর-কোঁ আপত্তিতে কর্ণপাতও করা হত না। ভিক্টোরীয় যুগে এসবই ছিল মামুলি ব্যাপার–কিন্তু পরবর্তী এই যুগের মানুষদের মার্জিত রুচি বরদাস্ত করতে পারে না এহেন জঘন্য আহার। বিভীষিকা এবং বিবমিষায় শিউরে ওঠে। কুৎসিত এইসব

খাবারদাবারের বদলে আছে বিভিন্ন রঙের এবং আকারের নয়নসুন্দর কেক আর পেস্ট। রং দেখে বোঝাও যাবে না, রাঁধা হয়েছে কোন পশুর উপাদান আর রস থেকে। একধারে আছে ছোট্ট একটা বাক্স। বাক্সর ভেতর থেকে রেললাইনের ওপর দিয়ে হড়কে বেরিয়ে আসবে একটার পর একটা ডিশ ভরতি এইসব পেস্ট আর কেক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ টেবিলের ওপরে হাত বুলিয়ে অথবা এক ঝলক দেখেই মনে করতে পারে, খুব মিহি সাদা বুটিদার কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে টেবিল। কিন্তু মোটেই তা নয়। অক্সিডাইজড ধাতু দিয়ে ঢাকা এই টেবিল খাওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকশো ছোট টেবিল রয়েছে হলঘরে। বেশির ভাগ টেবিল দখল করে বসে রয়েছে পরবর্তী এই যুগের মানুষরা–কোথাও একা, কোথাও দল বেঁধে। স্বরেস বসলেন এইরকমই একটা টেবিলে। অদৃশ্য অর্কেস্ট্রা নীরব ছিল বিরতির সময়ে। উনি বসতেই আরম্ভ হয়ে গেল শ্রুতিমধুর বাজনা।

প্রাতরাশ বা সংগীত নিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন না কিন্তু স্বরেস। চোখ ঘুরতে লাগল হলঘরে। যেন কারও আসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। একটু পরেই দেখা গেল তাকে। দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় এক পুরুষ। পরনে হলুদ এবং জলপাই-সবুজ পরিচ্ছদ। ঘরের শেষ প্রান্তে তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে হাত নেড়ে ডাকলেন স্বরেস। আগন্তুক এগিয়ে এল টেবিলের আশপাশ দিয়ে। অস্বাভাবিক তীব্রতা প্রকট হল দুই চোখে-মূর্ত হল আত্যন্তিক ব্যগ্রতা মুখের পরতে পরতে। বসে পড়লেন স্বরেস-হাতের নির্দেশে বসতে বললেন পাশের চেয়ারে।

বললেন, দেরি দেখে ভাবলাম বুঝি আর আসবেন না।

সময়ের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষাটা কিন্তু পালটায়নি–ভিক্টোরীয় আমলে যা ছিল, এখনও রয়েছে ঠিক তা-ই। ফোনোগ্রাফ মেশিনের এবং ওই জাতীয় বিবিধ রেকর্ডিং মেশিনের আবির্ভাবের ফলে এবং আস্তে আস্তে কেতাবজাতীয় পদ্ধতিগুলো অপসৃত হওয়ার দরুন মানুষের চোখই যে কেবল অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেয়েছে তা-ই নয়, মোটামুটি নিশ্চিন্ত একটা মান বজায় রাখতে পেরেছে ইংরেজি ভাষা–উচ্চারণ আর পালটায়নি–আগে যা ঘটতই, আটকানো যেত না।

সবুজ আর হলুদ পোশাক-পরা পুরুষ বললে, কৌতূহলোদ্দীপক একটা কেস নিয়ে আটকে পড়েছিলাম। নামকরা এক রাজনীতিবিদ অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাইনি এঁর জন্যে।

তাই নাকি? হিপনোটিস্টদেরও কাজ থাকে?

প্রাতরাশ এসে গিয়েছিল টেবিলে। অম্বর রঙিন একটা জেলি প্লেটে তুলতে তুলতে হিপনোটিস্ট বললে, পসার তো বাড়ছে।

সর্বনাশ! আপনারা না থাকলে দেশ তাহলে অচল!

জেলির আঘ্রাণ নিতে নিতে বললে হিপনোটিস্ট, অতটা অপরিহার্য অবশ্য নই। আমাদের ছাড়াও হাজার হাজার বছর দিব্যি চলেছে। দুশো বছর আগে পর্যন্ত তো বটেই ব্যাবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে তো মোটে একশো বছর আগে থেকে। হাজার হাজার ডাক্তার অন্ধের মতো হাতড়েছে তার আগে-ভেড়ার পালের মতো ছুটেছে একই পুরানো

চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে। নরক গুলজার করে রেখেছিল বলা যায়–মনের ডাক্তাররা কিন্তু ভুল করেনি–দু-চারজন হাতুড়ে ছাড়া।

জেলির দিকে মন দিল হিপনোটিস্ট।

স্বরিস বললেন, মানুষ জাতটার মস্তিষ্ক সে যুগে এতটা বিগড়ায়নি বলেই

মনের ওপর এরকম চাপ তো পড়েনি। হেসে-খেলে জীবন কেটে যেত। রেষারেষির বালাই ছিল না। খুব একটা বাড়াবাড়ি না হলে মানুষের মন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। বেগতিক দেখলে পাঠিয়ে দিত পাগলাগারদ নামে একটা জায়গায়।

নামটা শুনেছি। ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনিগুলোয় হামেশাই তো মেয়েদের উদ্ধার করে আনা হয় পাগলাগারদ বা ওই জাতীয় জায়গা থেকে। জঘন্য কাহিনি। লোকে শোনে কী করে বুঝি না।

আমি তো শুনি। ভালো লাগে। আধা-সভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার মনকে ভরিয়ে তোলে। সে যুগের পুরুষরা ছিল বলিষ্ঠ, মেয়েরা সরল। এইসব নিয়েই লেখা চাঞ্চল্যকর গল্পে ভেসে যাওয়ার মতো আনন্দ আর নেই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অদ্ভুত সেই যুগের কত আশ্চর্য ছবি... লোহার রেললাইন, ধোঁয়া-ওঠা সেকেলে লোহার ট্রেন, ঘিঞ্জি ছোট্ট বাড়ি, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। বই পড়ার নেশা আপনার নেই মনে হচ্ছে?

একেবারেই না। পড়েছি আধুনিক স্কুলে, ওসব সেকেলে বাজে ব্যাপারের মধ্যে মানুষ হইনি। ফোনোগ্রাফই যথেষ্ট আমার পক্ষে।

তা ঠিক, তা ঠিক, বলতে বলতে পরবর্তী খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত হল হিপনোটিস্ট। টেনে নিল একটা ঘন নীল রঙের মিষ্টান্ন-হিপনোটিজম নিয়ে সে যুগে অবশ্য কল্পনা-টল্পনারও বালাই ছিল না। দুশো বছর পরে একশ্রেণির মানুষের পেশাই হবে স্মৃতিপটে ছাপ এঁকে দেওয়া, অন্যায্য ভাবাবেগকে দমন করা, অথবা অনেক কিছুই সম্মোহনের সাহায্যে ঘটিয়ে দেওয়া। অথচ এই ধরনের কথাবার্তা শুনলে আগে সবাই হেসেই উড়িয়ে দিত। খুব কম লোকই জানত, মেসমেরিজুমের ঘোরে যে হুকুম দেওয়া যায়, তা ঘোর কেটে গেলেও মেনে চলতে বাধ্য হয়। হুকুম দিয়ে মেসমেরিজুমের ঘোরে অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেওয়া যায়, ইচ্ছামতো কাজ করানো যায় ঘোর কেটে যাওয়ার পরেও–এত ব্যাপার কজন। জানত বলুন? অথচ অনেক অসম্ভব ব্যাপারও যে ঘটতে পারে–এমন কথা বলার মতো লোকও তো ছিল। যেমন ধরুন শুক্র গ্রহে যাওয়া।

হিপনোটিজমের খবরও তাহলে রাখত?

নিশ্চয়! কাজেও লাগিয়েছে-যন্ত্রণা না দিয়ে দাঁত তোলার ব্যাপারে এবং ওই জাতীয় কাজে! এই নীল জিনিসটা তো খাসা। কী দিয়ে তৈরি জানেন?

মোটেই না! খেতে কিন্তু চমৎকার। আরও একটু নিন।

আর-এক দফা প্রশস্তি নিয়ে নীরবে নীল বস্তুর রসাস্বাদন করে গেল হিপনোটিস্ট।

স্বরেস বললেন, ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনির আলোচনায় আবার আসা যাক। আপনার সঙ্গে দেখা করত চেয়েছিলাম কিন্তু এই ব্যাপারে। বলে শ্বাস নিলেন গভীরভাবে।

চোখে চোখ রাখল হিপনোটিস্ট। বিরাম রইল না কিন্তু খাওয়ার।

স্বরেস বললেন, আমার একটি মেয়ে আছে। সুশিক্ষা যত রকমের হতে পারে–সবই দিয়েছি তাকে। মামুলি লেকচারার দিয়ে নয়–টেলিফোন লেকচারার মারফত! সহবত, নাচ, কথাবার্তা, দর্শন, শিল্পসমালোচনা–কিছু বাদ দিইনি। ইচ্ছে ছিল আমারই এক বন্ধুকে বিয়ে করুক। চেনেন নিশ্চয়–লাইটিং কমিশনের বিনডন, সাদাসিধে ছোট্ট মানুষ, কিন্তু খাসা মানুষ, তাই না?

তা ঠিক। বয়স কত আপনার মেয়ের?

আঠারো।

বিপজ্জনক বয়স। তারপর?

তারপর আর কী! ঐতিহাসিক রোমান্স নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করছে। বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। জীবনদর্শন শিকেয় উঠেছে। যতসব লড়াকু সৈনিকদের রাবিশ ব্যাপার মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছে। কী যেন নাম তাদের... ইট্রাসকান, তা-ই না?

ইজিপশিয়ান।

তা-ই হবে। তলোয়ার আর রিভলভার নিয়ে যাচ্ছেতাই সব ভয়ংকর মারদাঙ্গা ব্যাপার... রক্তারক্তি কাণ্ড... বীভৎস! বীভৎস! ফাঁদ পেতে টর্পেডো ধরা, বারুদ ফুটিয়ে স্প্যানিয়ার্ডদের উড়িয়ে দেওয়া, ননসেন্স অ্যাডভেঞ্চার! কোনও মানে হয়? এইসবের সঙ্গে

আরও একটা বদ ব্যাপার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছে... বিয়ে করবে ভালোবেসে। এদিকে বিনডন বেচারি...

বাধা দিয়ে বললে হিপনোটিস্ট, নতুন কিছু নয়। আগেও পেয়েছি এ জাতীয় কেস। অন্য ছোকরাটা কে বলুন তো?

হাল ছেড়ে দেওয়ার মুখভঙ্গিমা করলেন স্বরেস। জবাব দিতে গিয়ে যেন মাথা কাটা যাওয়ার উপক্রম হল বিষম লজ্জায়–প্যারিস থেকে উড়ুক্কু মেশিন এসে নামে যে মঞ্চে, সেইখানকার অতি সামান্য এক কর্মচারী। মেশিন থেকে নামতে সাহায্য করে, ফাইফরমাশ খাটে। রোমান্স গল্প-উপন্যাসে যেমনটি বলে, সেইরকমই দেখতে–মানে, মন্দ নয়– ভালোই। কাঁচা বয়স। মাথায় ছিট আছে। পুরাকালের বাতিল বিষয় মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছে। যেমন ধরুন, লিখতে জানে, পড়তে পারে! ভাবতে পারেন? আমার মেয়েটিও সেই একই দলের। লিখতে জানে, পড়তেও পারে! দুজনে কথাবার্তা বলে টেলিফোনে নয়– আর পাঁচটা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হলে তা-ই করত–কিন্তু এরা মনের কথা লিখে ফেলে... কী যেন নাম জিনিসটার?

চিঠি?

না, না, চিঠি নয়... ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে... কবিতা।

ভুরু তুলল হিপনোটিস্ট–ছোকরার সঙ্গে আপনার মেয়ের দেখা হল কীভাবে?

প্যারিস থেকে ফ্লায়িং মেশিনে এসে নামতে গিয়ে মেয়ে আমার হোঁচট খেয়ে পড়বি তো পড় একেবারে ছোকরার দুহাতের মধ্যে। বাস! শুরু হয়ে গেল সেই থেকে।

আচ্ছা?

এবার বুঝেছেন, কেন ধড়ফড় করে মরছি? এ জিনিস বন্ধ করতেই হবে। হিপনোটিস্ট আমি নই–জানি না কী করতে হবে। কিন্তু আপনি

হিপনোটিজম তো আর ম্যাজিক নয়।

তা তো বটেই। কিন্তু তবুও

রাজি না থাকলে কাউকে হিপনোটাইজ করা যায় না। বিনডনকে বিয়ে করার যার ইচ্ছে নেই, সম্মোহিত হওয়ার ইচ্ছেও তার থাকবে না। কিন্তু একবার যদি সম্মোহিত হয়ে যায়– যেই করুক-না কেন–কাম ফতে হয়ে যাবে।

আপনিই তো পারেন

পারিই তো! মনের জোর একবার ভেঙে দিতে পারলেই হল। তারপর হুকুম দেওয়া যাবে, যাও ভুলে ছোকরাকে। অথবা দেখলেই যেন মাথা ঘোরে... নয়তো, অজ্ঞান হয়ে যেয়ো। ঘটবেও ঠিক তা-ই। সম্মোহনটা জবরদস্ত হওয়া চাই

তা তো বটেই! ভুলে মেরে দেওয়াটাই সবচাইতে ভালো—

কিন্তু সমস্যা তো হিপনোটাইজ করানোটা। আপনি বললে তো রাজিই হবে না।

বলে, হাতে মাথা রেখে কিছুক্ষণ ভেবে নিল হিপনোটিস্ট।

খাপছাড়া স্বরে বললেন স্বরেস, নিজের মেয়েকে সিধে করতে পারার মতো দুঃখ আর হয় না।

হিপনোটিস্ট বললে, আপনার মেয়ের নাম-ঠিকানা দিন। বিষয়টা সম্বন্ধে আরও কিছু খবর জানিয়ে রাখুন। ভালো কথা, এর মধ্যে টাকাকড়ির ব্যাপার আছে নাকি?

দ্বিধায় পড়লেন স্বরেস।

তা... ইয়ে... একটু আছে বইকী। ওর মায়ের টাকা। মোটা টাকা। পেটেন্ট রোড কোম্পানিতে খাটছে। এই টাকাটার জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছি।

বুঝেছি, বলে স্বরেসকে জেরা শুরু করল হিপনোটিস্ট।

চলল অনেকক্ষণ।

ইতিমধ্যে এলিজাবেথিটা স্বরেস নামের মেয়েটি বসে আছে প্যারিস থেকে ফ্লায়িং মেশিন এসে নামে যে মঞ্চে, তার পাশের ওয়েটিং রুমে। এলিজাবেথিটা নামটা অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চারণে দাঁড়ায় এলিজাবেথ। থ হয়ে গেছে থিটা। সে যাক গে। এলিজাবেথিটার পাশে বসে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে তার ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন প্রেমিক-কবিতাটা লিখেছে সেইদিনই সকালে মঞ্চে ডিউটি দেওয়ায় সময়ে। শেষ হল

কবিতা। দুজনে মুখোমুখি যেন গভীর দুঃখী হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই হু হু। করে আকাশ থেকে নেমে এল আমেরিকা থেকে আসা বিশাল উড়ুক্কু যন্ত্রটা।

প্রথমে ছোট্ট, লম্বাটে, নীলচে একখণ্ড বস্তুর মতো দেখা গেল ফ্লায়িং মেশিনটাকে সুদূর গগনে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ওপরে। বড় হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। সুস্পষ্ট হল রং, ঝকঝকে সাদা। আরও কাছে আসতে আরও সাদা হল উড়ুক্কু যান। স্তরে স্তরে সাজানো পৃথক পালগুলো দেখা গেল স্পষ্ট। চওড়ায় প্রতিটা কয়েকশো ফুট। হিলহিলে বপুটা হল স্পষ্টতর। ফুটকি ফুটকি সারবন্দি প্যাসেঞ্জার চেয়ারগুলোও দেখা গেল সুস্পষ্ট। ভীমবেগে আকাশ থেকে খসে পড়া সত্ত্বেও নিচ থেকে মনে হল যেন ঠিকরে যাচ্ছে ঊর্ধ্বগগনের দিকে। শহরের ছাদের ওপর দিয়ে বিশাল ছায়া লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে মঞ্চের দিকে। যন্ত্রযানের আশপাশ দিয়ে শিস-দেওয়া শব্দে বাতাস ধেয়ে যাওয়ার আওয়াজ আছড়ে পড়ল কানের পরদায়। আর্তনাদ শোনা গেল সাইরেনের। মঞ্চে যারা রয়েছে, তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে হুঁশিয়ার করছে তাদের। আচম্বিতে ঝপ করে পড়ে গেল সাইরেনের বিকট আওয়াজ। পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। স্নিগ্ধ চোখে এলিজাবেথিটা তাকালে পাশে বসা ডেনটনের পানে।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল ডেনটনের ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। এ ভাষায় কথা বলা হত আদিম যুগে–বিশ্বসংসার যখন শৈশবাবস্থায়, তখন। নিরালায় ভাববিনিময়ের জন্যে এই ভাষাকেই বেছে নিয়েছে এলিজাবেথিটা আর ডেনটন। এ ভাষায় কথা বলে শুধু দুজনে মুখোমুখি বসে, দুজনের গণ্ডির বাইরে আর কেউ জানে না ভাষাটার শ্রুতিমাধুর্য। হোঁচট-খাওয়া আধো আধো ভাষায় ডেনটন ব্যক্ত করল তার মনোগত অভিপ্রায়। একদিন এলিজাবেথিটাকে নিয়ে সে-ও যাবে আকাশপথে সূর্যালোকিত আনন্দের দেশ জাপানে।

চারদিকের বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠে ছিটকে ধেয়ে যাবে শূন্যপথে–আধখানা দুনিয়া পেরিয়ে দুজনে পৌঁছাবে রোদ্দুর ঝলমলে নিপ্পনে।

এ স্বপ্ন ভালো লাগে এলিজাবেথিটারও। কিন্তু ভয় পায় শূন্যপথে লাফ দিতে হবেখন–পরে হবে বলে প্রবোধ দিয়ে গেল ডেনটনকে–সমানে উৎসাহ জুগিয়ে গেল ডেনটন সেদিনের নাকি আর দেরি নেই। বলতে বলতে শোনা গেল তীব্র বাঁশির আওয়াজ-মঞ্চে ডিউটি দেওয়ার সংকেত। বিচ্ছিন্ন হল দুজনে–যেভাবে প্রেমিকযুগল বিচ্ছিন্ন হয়েছে যুগে যুগে হাজার হাজার বছর ধরে। করিডর বেয়ে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল এলিজাবেথিটা। লিফ্ট থেকে নেমে এল পরবর্তীকালের লন্ডন শহরের একটি রাস্তায়। কাঁচ দিয়ে বাঁধানো ঝলমলে চকমকে রাস্তা–রোদে-জলে যাতে রাস্তার দফারফা না হয়–তাই এই স্ফটিক আবরণ। কোথায় লাগে ইন্দ্রপুরীর রাজপথ। কেননা, স্ফটিকাবৃত অপরূপ এহেন পথের ওপর দিয়ে বিরামবিহীনভাবে সঞ্চরমাণ রয়েছে চলমান মঞ্চ। গোটা শহর জুড়ে রয়েছে এই মঞ্চ–যেখানে খুশি যাওয়া যাবে শুধু টুপ করে মঞ্চে উঠে বসলেই। এইরকমই একটা মঞ্চে উঠে বসে নারী হোটেলের নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাল এলিজাবেথিটা। বিশ্বের যাবতীয় সেরা লেকচারারদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রয়েছে এখানকার প্রতিটা অ্যাপার্টমেন্টের। সেই মুহূর্তে কিন্তু এলিজাবেথিটার হৃদয় সূর্যালোকে মর্থিত থাকায় বিশ্বের সেরা লেকচারারদের প্রজ্ঞাও অতি-তুচ্ছ মনে হল সেই আলোর পশ্চাৎপটে।

দিনের মধ্যভাগ কাটল জিমন্যাশিয়ামে। দুপুরের খাওয়া খেল অন্য দুটি মেয়ে আর সেই বয়স্কা রমণীর সঙ্গে, যেসব মেয়েকে একাই দেখাশোনা করে–যুবতী মেয়েদের সহচরী রাখার রেওয়াজ ভিক্টোরীয় যুগের মতো এ যুগেও রয়ে গেছে। যে মেয়েদের মা নেই

অথবা যে মেয়েরা বিত্তশালী শ্রেণিভুক্ত, তাদের সহচরী থাকে এখনও। এককথায় এদের বলা হয় শ্যাপেরোন।

শ্যাপেরোন সেদিন একলা নয়। সঙ্গে রয়েছে একজন দর্শনার্থী। সাদা মুখ। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। পরনে সবুজ আর হলদে রঙের পোশাক। কথার ধোকড়। বলার ভঙ্গিমাটাও চমৎকার। সাত-পাঁচ কথা বলতে বলতে শুরু করল ঐতিহাসিক রোমান্স। নতুন ধরনের প্রেমকাহিনি। এ যুগের একজন নামী গল্প-বলিয়ে সদ্য উপহার দিয়েছেন শ্রোতাদের। কাহিনিটা অবশ্য ভিক্টোরীয় আমলের। কিন্তু একটা অভিনব আঙ্গিক সংযোজন করেছেন এ যুগের যশস্বী এই কথাশিল্পী। ভিক্টোরীয় যুগে প্রতিটি পরিচ্ছেদের মাথায় একটা শিরোনামা থাকত। উনি শিরোনামার অনুকরণে ছোট্ট ছোট্ট রংচঙে ভূমিকা জুড়ে দিয়ে প্রতিটি কাহিনিখণ্ডের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন। সেকেলে কেতাব কাহিনির চাইতেও আঙ্গিকটি তাই চমকপ্রদ। হলুদ এবং সবুজ বর্ণের পোপাশাক-পরা পুরুষটিও মুখর হয়েছে আঙ্গিকের প্রশংসায়। ছোট্ট ছোট্ট এই বাক্যের নাকি তুলনা হয় না। এক ঝলকে মনের চোখে ভাসিয়ে তোলে বেপরোয়া দামাল যুগটাকে। মানুষ আর পশু তখন নোংরা রাস্তায় গায়ে গা দিয়ে চলত–তিলধারণের জায়গা থাকত না পথে। কোণে কোণে ওত পেতে থাকত মৃত্যু। জীবন তো একেই বলে! জীবনের মতো জীবন! অথচ পৃথিবীর বহু জায়গা তখনও ছিল অনাবিষ্কৃত। এ যুগে বিস্ময় জিনিসটা বলতে গেলে একেবারেই লোপ পেয়েছে। এ যুগের মানুষ বড় ছিমছাম কাটছাঁট ধরাবাঁধা জীবনযাপন করে। তাল কাটে না, সুর কাটে না। মানুষ জাতটার সাহস, সহিষ্ণুতা, আস্থা মিলিয়ে যেতে বসেছে একটু একটু করে–মহৎ কোনও গুণই আর থাকবে না দুদিন পরে–এত ঘড়ি ধরে নিয়ম মেনে ওজন করে চলার ফলে।

কথার ফুলঝুরি শুনে মেয়েরা তো মন্ত্রমুগ্ধ। অবাক হয়ে শুনছে গৌরবময় অতীতের কাহিনি। এই লন্ডন শহরেই কী বিপুল উচ্ছ্বাস-আনন্দ-প্রাণস্ফুর্তির বন্যায় ভেসে গেছে সে যুগের মানুষ। লন্ডন এখন আরও বড় শহর, আরও জটিল–দ্বাবিংশ শতাব্দীর এই লন্ডনের সঙ্গে তুলনা চলে না ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ঘিঞ্জি নোংরা আধা-বর্বর লন্ডনের। এ যুগের লন্ডন থেকে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা এখন কোনও সমস্যাই নয়। তা সত্ত্বেও বক্তার বাচনভঙ্গিমার ফলে মনে হচ্ছে, বড় একঘেয়ে কষ্টের জীবন এই লন্ডনের মানুষদের–এর চাইতে অনেক উচ্ছল, অনেক প্রাণবন্ত জীবন ছিল আদি লন্ডনের আদিম মানুষদের।

কথোপকথনে প্রথমে অংশ নেয়নি এলিজাবেথিটা। কিছুক্ষণ পরেই এমনই জমে উঠল বিষয়বস্তু যে, দু-চারটে মন্তব্য না করে পারল না। যদিও বেশ লাজুকভাবে। কিন্তু বক্তার যেন নজরই নেই তার দিকে। কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল... আপন মনে। বলে যাচ্ছে আরও একটা চিত্তবিনোদনের পন্থা। সদ্য আবিষ্কৃত পন্থা। সম্মোহন করে নাকি শ্রোতাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গৌরবোজ্জ্বল অতীতে। সম্মোহিত অবস্থায় শ্রোতার কানে কানে বলে দেওয়া হয়, এখন তুমি এসেছ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হারিয়ে যাওয়া সেই যুগে। সম্মোহিত ব্যক্তি মনে করে, সে সত্যি সত্যিই রয়েছে পুরাকালের আনন্দ-অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে। বাস্তব জীবনের মতোই অতীতের রোমান্সে গা ভাসিয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্যে, প্রেমক্রীড়ায় মত্ত থাকে মনের আনন্দে, ঘোর কেটে যাওয়ার পরেও কিন্তু মনে থাকে সবকিছুই... যেন সত্যি, সত্যি, সব সত্যি!

বহু বছর ধরে এই আনন্দ দেওয়ার পথ খুঁজেছি, বললে হিপনোটিস্ট, ব্যাপারটা আসলে স্বপ্ন, নকল স্বপ্ন। এতদিনে জেনেছি কীভাবে এই নকল স্বপ্ন মানুষের মনে অজস্র রং

দিয়ে এঁকে দেওয়া যায়। ফলে, অভিজ্ঞতার বর্ণসুষমা, অ্যাডভেঞ্চারের পুনর্জাগরণ, ন্যক্কারজনক রেষারেষির মধ্যে থেকে পলায়ন... সবই এখন সম্ভব! অত্যাশ্চর্য এই আবিষ্কারের তুলনা হয় না!

সাগ্রহে শুধায় শ্যাপেরোন, আপনি জানেন নাকি কায়দাটা?

নিশ্চয়। কী স্বপ্ন চান, হুকুম দিয়েই দেখুন-না!

প্রথমে সম্মোহিত হল শ্যাপেরোন। আশ্চর্য স্বপ্ন নিয়ে আনন্দে আটখানা হল ঘোর কেটে যাবার পর।

উৎসাহ সঞ্চারিত হল অন্য মেয়েদের মধ্যেও। একে একে ধরা দিল হিপনোটিস্টের খপ্পরে। প্রেমমদির অতীতে ফিরে গিয়ে অবগাহন করে এল কৃত্রিম প্রেম-অভিজ্ঞতার ঝরনাধারায়। রোমান্স কে না চায়!

এলিজাবেথিটাকে কিন্তু কেউ সাধেনি। সে নিজেই এই আশ্চর্য মজার স্বাদ পেতে চেয়েছিল। তাই তাকে হিপনোটিস্ট নিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের জাদুপুরীতে–যেখানে গেলে আর নিজের কোনও স্বাধীনতা থাকে না, নিজের ইচ্ছেয় আর কিছু করা যায় না...

নষ্টামিটা সাঙ্গ হল এইভাবেই।

উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চের নিচে রাখা নিরিবিলি শান্তির চেয়ারটায় একদিন এসে বসল ডেনটন। কিন্তু এলিজাবেথিটাকে দেখতে পেল না। এল হতাশা, সেই সঙ্গে ক্রোধ। পরের

দিনও এল না এলিজাবেথিটা, তার পরের দিনও নিপাত্তা। এবার ভয় পেল ডেনটন। ভয় ভুলে থাকার জন্যে লিখতে বসল চতুর্দশপদী সনেট কবিতা–এলিজাবেথিটা এলেই গছিয়ে দেওয়া যাবে হাতে...

মনকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করে তিন-তিনটে দিন এইভাবে নিজের সঙ্গেই ভয়াবহ লড়াই করে গেল ডেনটন–নিষ্ঠুর সত্যটা প্রকট হল তারপর। কিন্তু এলিজাবেথিটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এ ধারণা মাথায় আনতে পারল না কিছুতেই–নিশ্চয় অসুস্থ, অথবা হয়তো ধরাধামেই আর নেই। বড় কষ্টে গেল একটা সপ্তাহ। সাত-সাতটা দিন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করল এলিজাবেথিটা তার কাছে কতখানি ডেনটনের সমস্ত ভুবন জুড়ে রয়েছে যে মেয়েটি, তাকে খুঁজে বার করতে হবে যে করেই হোক–হয়তো নিষ্ফলে যাবে তল্লাশি–তবুও খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে–তাকে ছাড়া যে জীবন বৃথা।

পুঁজি কিছু ছিল। সেই ভরসাতেই চাকরি ছেড়ে দিল ডেনটন। এলিজাবেথিটা কোথায় থাকে, সে কোন স্তরের কী পরিবেশের মানুষ–কিছুই জানা নেই ডেনটনের। এলিজাবেথিটাই বলেনি মেয়েলি রোমান্সের পুলকে, সমাজের দুজনের দুই স্তরে স্থান, ডেনটন না-ই বা জানল সে বৃত্তান্ত। তাই যেদিকে দুচোখ যায়, বেরিয়ে পড়ল ডেনটন। লন্ডন শহরটা চিরকালই গোলকধাঁধার মতো। ছিল ভিক্টোরীয় আমলেও, রয়েছে এখনও। কিন্তু তখন লন্ডনে থাকত মোটে চল্লিশ লক্ষ মানুষ, দ্বাবিংশ শতাব্দীর লন্ডনে থাকে তিন কোটি মানুষ। বিষম উৎসাহে এই জনারণ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ডেনটন, খাওয়া ভুলে গিয়েছিল, ঘুমানোর কথা মনে থাকেনি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস খুঁজেছে প্রেয়সীকে, ক্লান্তি আর হতাশায় উবে গেছে প্রথমদিকের বিপুল উৎসাহ, দেহে-মনে

নেমেছে অবসাদ, অধিক উত্তেজনা অপসৃত হওয়ার পর চিত্ত জুড়ে বসেছে অপরিসীম ক্রোধ। বহু মাস পর আশার ক্ষীণ প্রদীপটিও নিবে গেছে একসময়ে, তা সত্ত্বেও যন্ত্রবৎ খুঁজে গেছে এলিজাবেথিটাকে পথে পথে, গলিখুঁজিতে। যাকে দেখেছে, তারই মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থেকেছে। লিফ্ট, প্যাসেজ, অন্তহীন পথে-বিপথে হন্যে হয়ে খুঁজেছে... খুঁজেছে... মানুষ-চাকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটিমাত্র মানুষকে...

দৈব সহায় হল একদিন। দেখা পেল এলিজাবেথিটার।

সেদিন ছিল উৎসবের দিন। ক্ষুধায় কাতর ছিল ডেনটন। ভেতরে ঢোকার দক্ষিণা গুনে দিয়ে ঢুকেছিল শহরের অন্যতম দানবাকার ভোজনকক্ষে। টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিছক অভ্যাসের বশে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছিল চেয়ারে আসীন প্রতিটি মুখ...।

দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আচম্বিতে স্থাণুর মতো, নড়ার শক্তি তিরোহিত হয়েছিল পদযুগল থেকে, দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল কোটর থেকে, দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল অধরোষ্ঠ। মাত্র বিশ গজ দূরে বসে রয়েছে এলিজাবেথিটা, সটান চেয়ে রয়েছে তার দিকেই। কিন্তু এ কী চাহনি! পাথরের মূর্তির চোখেই যে এমন কঠোর, নির্ভাষ, নিরাবেগ চাহনি দেখা যায়। ডেনটনকে চিনতে পারার কোনও চিহ্নই নেই কুলিশ-কঠিন অক্ষিতারকায়।

মুহূর্তেক ডেনটনের পানে এহেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল এলিজাবেথিটা, পরক্ষণেই চেয়েছিল অন্যদিকে।

শুধু চাহনি দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে এই এলিজাবেথিটা ডেনটনের সেই এলিজাবেথিটা নয়। কিন্তু ডেনটনের এলিজাবেথিটাকে যে ডেনটন চেনে হাত দিয়ে,

কানের পাশে দোলানো চূর্ণ-কুন্তল দিয়ে। মাথা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে কী সুন্দরভাবেই না দুলে ওঠে অলকগুচ্ছ। পাশে বসা মানুষটার কথা শুনে সংযত হেসে তার দিকে মুখ ফেরাল এই এলিজাবেথিটা। মানুষটাকে কটমট করে দেখল ডেনটন। খর্বকায় নির্বোধ আকৃতি। পরিচ্ছদ বুড়োটে সরীসৃপের মতন। মাথায় বাতাস-ফোলানো জোড়া শিং। এরই নাম বিনডন, এলিজাবেথিটার পিতৃদেবের মনোনীত পাত্র।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে ছিল ডেনটন বিস্ফারিত চোখে–সমস্ত রক্ত নেমে গিয়েছিল মুখ থেকে। তারপরেই মনে হল, বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। বসে পড়েছিল পাশের ছোট্ট টেবিলের সামনে। বসে ছিল কিন্তু এলিজাবেথিটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, চোখাচোখি তাকানোর সাহসও ছিল না। সামলে নেওয়ার পর আবার তাকিয়ে দেখেছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে। দাঁড়িয়েছে এলিজাবেথিটা আর বিনডন। উঠে দাঁড়িয়েছে তার বাবা আর শ্যাপেরোনও। যাওয়ার সময় হয়েছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে ছিল ডেনটন-নিশ্চল, নিথর, নীরব। আস্তে আস্তে দূরে সরে গিয়েছিল চার মূর্তি। সংবিৎ ফিরে পেয়েছিল ডেনটন। উঠে দাঁড়িয়ে ধাওয়া করেছিল পেছনে। চলমান মঞ্চের মোড়ে এসে দেখেছিল এলিজাবেথিটা আর শ্যাপেরোনকে। উধাও হয়েছে বিনডন আর স্বরেস।

ধৈর্য আর বাধ মানল না। এলিজাবেথিটার সঙ্গে এখুনি দুটো কথা না বললে যেন মৃত্যু হবে মনে হল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল দুজনের দিকে। ওরা বসে ছিল দুটো চেয়ারে। ডেনটন বসল পাশের চেয়ারে। বিষম উত্তেজনায় ক্ষিপ্তের মতো তখন থরথর করে কাঁপছে ডেনটনের সাদা মুখ।

হাত রেখেছিল এলিজাবেথিটার মণিবন্ধে–এলিজাবেথ, তুমি?

অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ ফিরিয়েছিল এলিজাবেথিটা। অজানা-অচেনা মানুষ গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলে যুগে যুগে তরুণীরা যেভাবে ভয় পেয়েছে–সেই ভয় ছাড়া আর কিছুই প্রকটিত হল না দুই নয়নতারকায়।

এলিজাবেথ! উত্তেজনা-বিকৃত নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারেনি ডেনটন – এলিজাবেথ! কী সর্বনাশ! চিনতে পারছ না?

সভয়ে সরে বসেছিল এলিজাবেথিটা। উজ্জ্বল-চক্ষু ধূসর-কেশী শ্যাপেরোন ঝুঁকে বসে নিরীক্ষণ করেছিল ডেনটনকে–কী বললেন?

ইনি আমাকে চেনেন।

চেনো এঁকে?

না, কপালে হাত রেখে ক্লিষ্ট কণ্ঠে যেন শেখানো বুলি আওড়ে গিয়েছিল এলিজাবেথিটা, চিনি না... চিনি না... চিনি না।

কি-কিন্তু আমি যে ডেনটন। যার সঙ্গে কত কথা বলতে তুমি ফ্লায়িং স্টেজের নিচে বসে? মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না কবিতাগুলো–

না, না, না, চিনি না... চিনি না... আরও যেন কী আছে, কিন্তু মনে পড়ছে না... শুধু জানি... এঁকে আমি চিনি না– নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে কালো হয়ে ওঠে এলিজাবেথিটার মুখচ্ছবি।

এইভাবেই চলেছিল কিছুক্ষণ। এলিজাবেথিটা চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারেনি তোতা পাখির মতো শুধু আওড়ে গেছে একটাই কথা–চিনি না... চিনি না... চিনি না ওঁকে। ক্ষিপ্তের মতো মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ডেনটন–কবিতার কথা, গানের কথা, প্রেমকাহিনির কথা।

কিন্তু বৃথাই। ক্লান্ত অবসন্ন এলিজাবেথিটাকে অবশেষে বাঁচিয়ে দিয়েছিল শ্যাপেরোন। ভাগিয়ে দিয়েছিল ডেনটনকে। পাগলের মতো চলমান মঞ্চ থেকে মঞ্চে লাফিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল ডেনটন। সেইদিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে এলিজাবেথিটা শুধু জানতে চেয়েছিল, লোকটা কে? অনিমেষে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে শ্যাপেরোন বলেছিল, বাজে লোক -মাথায় ছিট আছে। জীবনে দেখিনি। খামকা ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না।

এই ঘটনার পরেই সবুজ-হলদে পোশাক-পরা হিপনোটিস্টের কনসাল্টিং চেম্বারে আবির্ভূত হল একজন নয়া মক্কেল। তরুণ বয়স। উশকোখুশকো চুল। বিধ্বস্ত আকৃতি। উন্মাদের মতো শুধু বললে, ভুলতে চাই... ভুলিয়ে দিন... সব ভুলিয়ে দিন।

প্রশান্ত চোখে যুবকের পোশাক, আচরণ এবং মুখাবয়ব অবলোকন করে বললে হিপনোটিস্ট–ভুলে যাওয়ায় যন্ত্রণা অনেক কম। কিন্তু আমার দক্ষিণা যে বেশ চড়া।

ভুলতে যদি পারি...

হয়ে যাবে। আপনার নিজের ইচ্ছে যখন আছে... অসুবিধে হবে না। এর চাইতেও কঠিন কেস করেছি আমি। এই তো সেদিন একটি মেয়েকে সব ভুলিয়ে দিলাম– ভালোবাসার ব্যাপার ছিল।

হিপনোটিস্টের পাশে বসল তরুণ যুবা। জোর করে সংযত রাখল ছটফটানি। বললে অবরুদ্ধ কণ্ঠে, নাম তার এলিজাবেথটা স্বরেস।

কথাটা বলেছিল হিপনোটিস্টের চোখে চোখে চেয়ে। তাই দেখেছিল, নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় উথলে উঠল তার চোখে। বুঝেওছিল তৎক্ষণাৎ। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে কাঁধ খামচে ধরেছিল হিপনোটিস্টের। মুখে কথা সরেনি কিছুক্ষণ।

তারপরেই ফেটে পড়েছিল বিষম ক্রোধে। ফিরে পেতে চেয়েছিল এলিজাবেথিটাকে। আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ধস্তাধস্তি। দুজনের কেউই অ্যাথলিট নয়। কুস্তি করতে কেউই শেখেনি। এ যুগে ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয় কেবল বিশেষ উপলক্ষে। ব্যায়ামচর্চার রেওয়াজ আর নেই। কিন্তু দুজনের মধ্যে গায়ে জোর বেশি তরুণ যুবার। তাই অচিরেই আছড়ে ফেলল হিপনোটিস্টকে। কপালে চোট লাগায় জ্ঞান হারাল সম্মোহনের জাদুকর কিছুক্ষণের জন্যে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল, তার-ছিড়ে-আনা একটা ল্যাম্প বাগিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডেনটন! খুনে চাহনি। খুনে কণ্ঠেই সে বললে, কথা না শুনলে প্রস্তর যুগের অস্ত্রচালনা করবে এখুনি। পাথরের হাতিয়ারের বদলে এই ল্যাম্প ছাতু করবে খুলি। অজ্ঞান থাকার সময়ে কাগজপত্র হাঁটকে পেয়েছে এলিজাবেথিটার

ঠিকানা। ফোন করে দিয়েছে। শ্যাপেরোনকে নিয়ে সে আসছে এখুনি। এলেই যেন তাকে সম্মোহন করা হয়। ভাঁওতা দিতে হবে শ্যাপেরোনকে–সম্মোহন করা হচ্ছে মর্কটের মতো কদাকার ছোকরাটাকে এখুনি বিয়ে করার জন্যে–বললেই সে চুপ করে থাকবে। সম্মোহনের ঘোর এসে গেলেই ফিরিয়ে দিতে হবে এলিজাবেথিটার পূর্বস্মৃতি।

ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিল সম্মোহক ভদ্রলোক। আধুনিক মানবজাতির আচরণবিধি গ্রন্থে এ জাতীয় প্রস্তর-যুগীয় হামলাবাজির কথা কোথাও লেখা নেই। অটল থেকেছে ডেনটন। বেচাল দেখলেই ছাতু করবে খুলি। নিজে মরতে তার দ্বিধা নেই।

কিন্তু খুলির মায়া যে বড় মায়া–নির্দ্বিধায় জানিয়েছিল সম্মোহক। চিকিৎসকের সততা এখন শিকেয় তোলা থাকুক–কাকপক্ষীও জানবে না, এলিজাবেথিটা পূর্বস্মৃতি ফিরে পেল কী করে। ডেনটনের প্রতিও আক্রোশ মিলিয়ে যাবে দুদিনে। অনেকক্ষণ মেঝেতে বসে রয়েছে সম্মোহক, এখন উঠে বসলে হয় না? এলিজাবেথিটা যে এসে যাবে এখুনি।

বিজন শহরতলি

দুনিয়াটা নাকি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যতটা পালটেছে, ততটা পালটায়নি বিগত পাঁচশো বছরের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দী মানব-ইতিহাসে উষালগ্ন বিশাল নগরীর সূচনা ঘটে সেই শতাব্দী থেকেই–অবসান ঘটে সেকেলে গ্রামীণ জীবনের।

অগণন প্রজন্ম ধরে যেমনটি ঘটে এসেছে, ঠিক সেইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানবজাতির অধিকাংশ বসবাস করত শহরতলিতে-গ্রাম অঞ্চলে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ থাকত ছোট ছোট শহর আর গ্রামে। সরাসরি নিযুক্ত ছিল কৃষিকর্মে অথবা কৃষিবিদের সহায়ক কাজকর্মে। পর্যটনের সুযোগ ঘটত কদাচিৎ-নিবাস রচনা করত কর্মস্থানের সন্নিকটে। কারণ দ্রুত ভ্রমণের উপযোগী যানবাহনের আবির্ভাব তখনও ঘটেনি। পর্যটনে বেরত মুষ্টিমেয় যে কজন, পদব্রজ, পালতোলা জাহাজ অথবা ঘোড়ায় টানা গাড়ির শরণ নিত। শেষোক্ত শকটটির গতিবেগ ছিল দিনে বড়জোর ষাট মাইল। ভাবতে পারেন? সারাদিনে মাত্র ষাট মাইল! মন্থরগতি সেই যুগে ক্কচিৎ দু-একটা শহর গজিয়ে উঠত লোকালয়ের ধারেকাছে বন্দর-শহর অথবা সরকারি দপ্তর-শহর হিসেবে। কিন্তু এক লাখ মানুষ থাকার মতো শহর আঙুলে গোনা যেত গোটা পৃথিবীতে! এই চিত্র ছিল ঊনবিংশ শতকের শুরুতে। শতাব্দীর শেষে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, বাষ্পীয় পোত এবং জটিল কৃষিযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর পালটে গেল চিত্র। আগেকার চিত্রে ফিরে যাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই রইল না। শহরের মজা আর অগণন সুখ-সুবিধে রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় গেড়ে বসে গেল মানুষ জাতটার। রাতারাতি গজিয়ে উঠতে লাগল পেল্লায় পেল্লায় নগরী–বিশাল দোকান–শতসহস্র আরাম এবং বিরামের ব্যবস্থা। শুরু হয়ে গেল গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা। শহরের দিকেই আকৃষ্ট হল মানবজাতি। দলে দলে মানুষ ধেয়ে গেল শহরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সুখের সন্ধানে। চাহিদা পড়ে গেল শ্রমজীবীদের-যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে। পল্লিপ্রকৃতিকে জবাই দিয়ে দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল বৃহত্তর প্রমোদকেন্দ্র এবং শিল্পকেন্দ্র।

ভিক্টোরীয় যুগের লেখকরা দিবানিশি এই কাহিনিমালাই গেঁথে গেছেন তাঁদের গল্প উপন্যাসে–মানুষ স্রোতের মতো ধেয়ে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে। একই উপাখ্যান রচিত হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনে, নিউ ইংল্যান্ডে, ইন্ডিয়ায় এবং চায়নায়–পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটছে স্ফীতোদর বড় বড় শহরে। অপরিহার্য এই পরিবর্তন যে আসলে দ্রুত পরিবহণব্যবস্থার আবির্ভাবে, এ তথ্য উপলব্ধি করেছেন মাত্র কয়েকজনই–বালসুলভ প্রচেষ্টা চলেছে পৃথিবীজোড়া শহরমুখী চৌম্বক আকর্ষণ ঠেকিয়ে রাখার।

নব-ব্যবস্থার নিছক উষালগ্ন কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দী। শুরু তখুনি। নবযুগের বড় বড় শহরে অসুবিধে ছিল বীভৎস মাত্রায়। ধোঁয়ায় ভরপুর, কুয়াশায় অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর এবং কোলাহলময়। ভবন নির্মাণের নতুন পদ্ধতি, ঘর উষ্ণ রাখার নতুন ব্যবস্থা পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তি দিল শহর সভ্যতাকে। ১৯০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে প্রগতি হল আরও দ্রুত; ২০০০ থেকে ২১০০-র মধ্যে মানবজাতির উন্নয়ন এমনই লাফ মেরে মেরে এগিয়ে গেল, এমনই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ঘটতে লাগল যে, ভিক্টোরীয় যুগের সুব্যবস্থাকেও অবশেষে মনে হল যেন অলস প্রশান্ত জীবনের একটা অবিশ্বাস্য দূরদর্শন।

মানবজীবনটাকে চূড়ান্তভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ রেলপথ প্রবর্তন। পরিবহণব্যবস্থার সন্ধিক্ষণ। ২০০০-এ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল রেলপথ আর সড়ক। রেললাইন বঞ্চিত রেলপথগুলো ঝোপে ভরতি নালা হয়ে পড়ে রইল ভূপৃষ্ঠ জুড়ে। সড়কগুলো একদা নির্মিত হয়েছিল হাত দিয়ে দুরমুশ পিটিয়ে, বদখত লোহার রোলার চালিয়ে; চকমকি পাথর আর মাটি দিয়ে পেটাই অদ্ভুত সুপ্রাচীন সেইসব পথে ছড়ানো থাকত হরেকরকম আবর্জনা; লোহার অশ্বক্ষুর আর শকটচক্রে বিচিত্র পথ কেটে ফালাফালা হয়ে যেত কয়েক ইঞ্চি গভীর ক্ষত দগদগ করত রাস্তার সর্বত্র; ক্ষতবিক্ষত হতশ্রী এইসব পথ এখন লোপ পেয়েছে ধরাধাম থেকে–সে জায়গায় এসেছে এডহ্যামাইট নামক একটি উপাদান দিয়ে নির্মিত পেটেন্ট করা পথ। পেটেন্ট যিনি নিয়েছিলেন–তাঁর নামই অমর হয়ে রয়েছে এডহ্যামাইট নামটার মধ্যে। বিশ্ব ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করবার মতো যে কটা আবিষ্কার আজ পর্যন্ত হয়েছে, ছাপাখানা আর স্টিম তার মধ্যে পুরোধা। এডহ্যামাইট পড়ে এই পর্যায়ে।

আবিষ্কারকের নাম এডহ্যাম। প্রথম যখন আবিষ্কার করেন উপাদানটা, গুরুত্বটা বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন, ইন্ডিয়া-রবারের সস্তা বিকল্প উদ্ভাবিত হল বুঝি। সস্তা তো বটেই– টনপিছু দাম মোটে কয়েক শিলিং। কিন্তু একটা আবিষ্কার যে কত কাজে লাগতে পারে, তার ফিরিস্তি কি কেউ দিতে পারে? কাজেই স্বয়ং আবিষ্কারক এডহ্যামাইটের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারলেও, পেরেছিলেন ওয়ামিং নামে এক ভদ্রলোক। শুধু গাড়ির টায়ারে নয়, রাস্তাঘাট বাঁধানোর কাজে বস্তুটাকে লাগানো গেলে যে পৃথিবীর খোলসটাকে মেজে-ঘষে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা যাবে–এ ধারণা মাথায় আনতে পেরেছিলেন। ফলে, তাঁরই প্রচেষ্টা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার সুফল হিসেবে ভূগোলকের সর্বত্র আবির্ভূত হল আধুনিক রাস্তার জটাজাল।

এক-একটা সড়ক লম্বালম্বিভাবে অনেক ভাগে ভাগ করা। দুদিকের কিনারা সংরক্ষিত শুধু সাইকেল আর সেইসব গাড়ির জন্যে, যাদের গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র পঁচিশ মাইলের বেশি নয়। তার গা ঘেঁষে ভেতরের দিক দিয়ে ধেয়ে যায় মোটরগাড়ি–গতিবেগ যাদের ঘণ্টায় একশো মাইল তো বটেই। একদম মাঝের অংশটুকু সংরক্ষিত রয়েছে অত্যন্ত বেগবান যন্ত্রযানদের জন্যে–গতিবেগ যাদের ঘণ্টায় দেড়শো মাইল কি তারও বেশি। এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টির জন্যে অবশ্য প্রচুর টিটকিরি হজম করতে হয়েছে ওয়ামিং বেচারিকে।

ওয়ামিং কিন্তু টলেননি। প্ল্যান অনুযায়ী সড়ক তো বানালেন। কিন্তু দশ-দশটা বছর বেবাক ফরসা হয়ে যাওয়ার পরেও একদম মাঝের অতিশয় বেগবান যন্ত্রযানদের জন্যে সংরক্ষিত অংশে ধুলোই জমা হয়ে গেল–গাড়ি আর চলল না। ওয়ামিং মারা যাওয়ার আগেই অবশ্য সবচেয়ে ভিড় দেখা গিয়েছিল একদম মাঝের অংশটুকুতেই। ঝড়ের বেগে বিশাল ধাতব কাঠামোর গাড়ি হরবখত ধেয়ে যেত সড়কের মাঝখান দিয়ে–বিরাট চাকাগুলোর ব্যাস বিশ থেকে তিরিশ ফুট তো বটেই। গতিবেগও বেড়ে চলল বছরে বছরে খুঁটিনাটি উন্নতিসাধনের মধ্যে দিয়ে–শেষকালে পৌঁছাল ঘণ্টায় দুশো মাইলে। গতিবেগের এই বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব ঘটে গেল ক্রমবর্ধমান শহরগুলোর ক্ষেত্রেও। বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের ফলে ধুলো, ধোঁয়া, কুয়াশা, আবর্জনা অদৃশ্য হয়ে গেল (ভিক্টোরীয় যুগে যা ছিল শহরের সৌন্দর্য)। আগুনের বদলে এল বৈদ্যুতিক চুল্লি। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে আইন প্রণয়ন হয়ে গেল–যে আগুন নিজের ধোঁয়া গিলে খেতে না পারবে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সদ্য-আবিষ্কৃত কাঁচজাতীয় একটা বস্তু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল শহরের সমস্ত পথঘাট, পাবলিক পার্ক আর বাজারহাট। লন্ডন শহরটার ওপর এই জাতীয় ছাদ নির্মাণ বলতে গেলে থেমে নেই

আজও চলছে তো চলছেই। আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণ করার ব্যাপারে বেশ কিছু অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মূর্খের মতো নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর থেকেই পালটে গেল লন্ডনের সুরতখানা–আগে যা ছিল চ্যাপটা, থ্যাবড়া থ্যাবড়া বাড়ি সমাকীর্ণ আদিম শহর–যে শহরের মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের দৈন্যদশা প্রকট ছিল বড় বেশিভাবে–এখন সেই শহরেই মেঘলোককে চুম্বন দেওয়ার প্রয়াসে ধাঁ ধাঁ করে উঠে গেল লম্বা লম্বা সৌধ। দায়িত্ব বাড়ল মিউনিসিপ্যালের। জল, আলো আর পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করলেই শুধু চলবে না–বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থায় যেন ত্রুটি না থাকে।

মানুষকে অনেক সুখ-সুবিধে এনে দিয়েছিল এই দুশো বছর। এনেছিল অনেক পরিবর্তন। সব কাহিনি শোনাতে গেলে ডেনটন-এলিজাবেথিটার কাহিনি থেকে সরে যেতে হবে আমাদের। আকাশে ওড়া যে সম্ভবপর তা কি কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিল দুশো বছর আগে? উপর্যুপরি আবিষ্কারের পর আবিষ্কারে সম্ভব হয়েছিল এহেন অসম্ভব কাণ্ডও। হেঁশেল নিয়ে আটকে থাকতে কেউ আর চায়নি, অসংখ্য হোটেল নিয়েছিল রান্নাবান্না এবং উদরপূর্তির দায়িত্ব। চাষবাস নিয়ে যারা চিরকাল মাঠেঘাটে, খেতখামারে কাটিয়েছে, আস্তে আস্তে তারা নিবাস রচনা করেছিল শহরে। গোটা ইংল্যান্ডে শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল চারটে শহর-বিরাট শহর! লক্ষ লক্ষ মানুষ আস্তানা নিয়েছিল এক-একটা শহরে। শহরতলির বাড়িঘরদোরগুলো ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে উঠেছিল এই দুশো বছরে–মানুষজন কেউ থাকত না সেসব বাড়িতে।

বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বটে ডেনটন আর এলিজাবেথিটা–পুনর্মিলনও ঘটেছিল। বিয়েটা কিন্তু হয়নি। দোষটা ডেনটনেরই। ওই একটা দোষই কেবল ছিল বেচারির। পকেটে ছিল না। পয়সা। একুশ বছরে পা না-দেওয়া পর্যন্ত এলিজাবেথিটার ভাঁড়েও মা ভবানী, ওর তখন

বয়স মোটে আঠারো। ওই যুগের রীতি অনুযায়ী একুশ বছর হলেই পাবে মায়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি। ফলে, শিকেয় তোলা রয়েছে বিবাহ-পর্ব। দিবারাত্র ঘ্যানর ঘ্যানর করত এলিজাবেথিটা, তার মতো অসুখী আর কেউ নেই, কেউ বোঝে না, কেউ না, একমাত্র ডেনটন ছাড়া। ডেনটন কাছে না থাকলে দুচোখে অন্ধকার দেখে। ডেনটনও ঘ্যানর ঘ্যানর করে যেত একইভাবে, চৌপর দিনরাত কাছে পেতে চাইছে এলিজাবেথিটাকে, কিন্তু পাচ্ছে কই? দুজনের দুঃখ বিনিময় চলত দেখাসাক্ষাৎ হলেই।

উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চের ওপর রক্ষিত ছোট্ট আসনে বসে একদিন এইসব কথাই হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। জায়গাটা লন্ডন শহরের পাঁচশো ফুট ওপরে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে আধুনিক লন্ডনকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লন্ডন বাসিন্দাদের কাছে সে চিত্র তুলে ধরা বিলক্ষণ মুশকিলের ব্যাপার। ম্যামথ হোটেলশ্রেণি, স্ফটিক-প্রাসাদ, শহরজোড়া অতিকায় সৌধমালা কল্পনাতে আনাও কঠিন। অগুনতি ছাদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা বনবন করে ঘুরে চলেছে হাওয়ালের চাকা।

ডেনটন-এলিজাবেথিটার কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বিশাল কারাগারে বন্দি রয়েছে দুজনে। আরও তিনটে বছর থাকতে হবে এই খাঁচায়–তারপর পাবে মুক্তি–বহুবার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে, এখনও চলছে একই দুঃখের চর্বিতচর্বণ। এই তিন-তিনটে বছর ঠায় বসে থাকা যে অতীব কষ্টকর, একেবারেই অসম্ভব এবং মনের ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার, এ ব্যাপারে একমত হয়েছে দুজনেই। ডেনটন জানিয়েছে, তিন বছর ফুরানোর আগেই অক্কা না পায় দুজনে!

চোখে জল এসে গেল এলিজাবেথিটার। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

কিন্তু এহেন শহরে কপর্দকহীন অবস্থায় বিয়ে করাটাও তো একটা ভয়াবহ ব্যাপার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবশ্য পাতায় ছাওয়া মেটে কুঁড়েঘরে দাম্পত্য জীবনযাপনের মতো সুখাবহ আর কিছুই ছিল না। পাখি নেচে বেড়াত গাছের ডালে ডালে, ফুলের সৌরভে মাতাল হয়ে থাকত বাতাস, অজস্র বর্ণ আচ্ছন্ন করত চিত্ত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সে দিন পালটাতে আরম্ভ করেছিল। গরিব মানুষরাও এখন শহরের নিচুতলার নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তবে হ্যাঁ, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও শহরের নিচুতলা ছিল আকাশ চন্দ্রাতপের ঠিক তলাতেই; মাটি, কাদা, বন্যার জল, ধোঁয়া, আবর্জনা, এই ছিল নিচুতলার চেহারা। পর্যাপ্ত জল পর্যন্ত পেত না। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলেই ইতর প্রাণীর মতো গাদাগাদি অবস্থায় কোনওমতে দিন গুজরান করত নিচুতলার মানুষ। রোগের ডিপো ছিল এদের অঞ্চলটুকুই, সংক্রমণের এমন অনুকূল পরিবেশ পাত্তা পেত না বড়লোকদের পাড়ায়। দ্বাবিংশ শতাব্দীতে পালটে গেছে চিত্র। লন্ডন শহর এখন বহুতল নগরী, চারপাশে না ছড়িয়ে মাথা তুলে গেছে ওপরদিকে। যাদের পয়সা আছে, তারা থাকে ওপরতলায় খানদানি হোটেলকক্ষে; মেহনতি মানুষরা থাকে নিচের তলায় এবং মাটির তলাতেও।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে লন্ডনেই ইস্ট এন্ড পাড়ার মেহনতি মানুষরা যেভাবে জীবনযাপন করে এসেছে, এখনও তার রদবদল ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু কথ্য ভাষায় পরিবর্তন এসেছে বেশ বড় রকমের। এই নিচের তলাতেই কেটে যায় তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু, ওপরতলায় ওঠে কদাচিৎকাজের সুযোগ পেলে। কষ্ট? অসুবিধে? দুর্ভোগ? গা সওয়া হয়ে গেছে। কেননা এই পরিবেশেই এদের অধিকাংশই যে মানুষ হয়েছে,

কিন্তু ডেনটন আর এলিজাবেথিটার কাছে এই নারকীয় জীবনযাপন যে মৃত্যুর অধিক ভয়ংকর।

এলিজাবেথিটা কি ধারদেনা করতে পারে না? বিষয়সম্পত্তি হাতে এলে শোধ করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মুখ দিয়ে ডেনটন তা বার করতেও যে পারছে না। এলিজাবেথটা যদি তার অন্য অর্থ করে?

লন্ডন থেকে প্যারিসে যাওয়ার মতো গাড়ি ভাড়া নেই এলিজাবেথিটার হাতে। প্যারিস শহরটাও পৃথিবীর অন্যান্য শহরের মতো বড়লোকদের থাকার জায়গা। বড় খরচ। লন্ডন। শহরের মতোই সেখানে নিবাস রচনা অসম্ভব।

আহা রে! এর চাইতে অতীতের সেই দিনগুলোতেই যে ফিরে যাওয়া ছিল অনেক। ভালো। রোমান্টিক কল্পনারঙিন চোখে ঊনবিংশ শতাব্দীর হোয়াইট চ্যাপেলকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিল ডেনটন।

ডুকরে কেঁদে উঠেছিল এলিজাবেথিটা। তিন-তিনটে বছর–দীর্ঘ ছত্রিশটা মাস এইভাবেই কি কষ্ট করে কাটাতে হবে?

আচম্বিতে একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল ডেনটনের মগজে। গ্রামে গেলে কেমন হয়?

দারুণ অ্যাডভেঞ্চার সন্দেহ নেই। কিন্তু সিরিয়াসলি তা-ই কি চায় ডেনটন? ডাগর চোখ তুলে চেয়েছিল এলিজাবেথিটা। থাকা হবে কোথায়?

কেন, ওই পাহাড়ের ওপারে বিস্তর বাড়িঘরদোর তো এখনও আছে। এককালে মানুষ থাকত সেখানে। এখনই বা অসম্ভব হবে কেন? ডেনটন বুঝিয়েছিল এলিজাবেথিটাকে।

বলেছিল, গ্রাম আর শহরের ধ্বংসাবশেষ তো ফ্লায়িং মেশিন থেকেই দেখা যায়। পড়েই আছে–মাটিতে মিশিয়ে দিতে গেলেও তো খরচ হবে–ফুড কোম্পানি সে খরচ করতে রাজি নয়। গোরু, মোষ, ভেড়া চরবার জায়গা এখন। রাখালদের কাউকে পয়সা দিলেই খাবার এনে দেবে। একখানা বাড়ি নিজেরাই মেরামত করে নিয়ে দিব্যি থাকা যাবে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল এলিজাবেথিটা। প্রদীপ্ত চোখ। দারুণ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে। কিন্তু পলাতক আসামিদের ডিপো যে ওখানে... যত চোর-ডাকাতদের আস্তানা...।

ছেলেমানুষের মতো ডেনটন তখন বলেছিল, তাতে কী! একটা তলোয়ার জুটিয়ে নিলেই হল!

বিষম উৎসাহে চোখ জ্বলে উঠেছিল এলিজাবেথিটার। তলোয়ার জিনিসটা সম্পর্কে আগেই অনেক কথা সে শুনেছে, মিউজিয়ামে দেখেওছে। রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চার সৃষ্টি করেছে ইস্পাতের এই হাতিয়ার অতীতকালে–সব বীরপুরুষই সঙ্গে রাখত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাই জানতে চায় আরও বৃত্তান্ত। যতই শোনে, ততই উৎসাহ আর উত্তেজনার মাদল বাজনা বাজতে থাকে অণু-পরমাণুতে। খাবারদাবার? দিন দশ-বারোর খাবার সঙ্গে নিলেই হল। ওটা কোনও সমস্যাই নয়। কেননা, এ যুগের খাবারমাত্রই কৃত্রিম পুষ্টিজমিয়ে শক্ত করে এতটুকু সাইজে নিয়ে আসা। দশ-বারো দিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এমন কী ব্যাপার? বাড়ি মেরামত না-হওয়া পর্যন্ত ছাদহীন ঘরগুলোয় আকাশ

চন্দ্রাতপের তলায় শুয়ে থাকলেই হল। এখন গরমকাল। লন্ডন বাসিন্দারা শিল্পীর হাতে ছবি আঁকা, বাহারি আলোয় ঝলমলে ছাদওয়ালা ঘরে থাকতে থাকতে ভুলেই গেছে, তার চাইতেও ভালো কড়িকাঠ নিয়ে বসে আছেন স্বয়ং প্রকৃতিদেবী তাঁর লীলানিকেতনে। ওই আকাশে লক্ষ-কোটি নক্ষত্রর ঝিকিমিকি... অমন কড়িকাঠের তলায় ঘুমানোর মতো মজা কি আর হয়?

ডেনটনের আবেগময় ভাষা পাগল করে দিয়েছিল এলিজাবেথিটাকে। প্রথমে একটু দ্বিধা ছিল ঠিকই। এক হপ্তা পরে তা ফিকে হয়ে এল, একেবারেই মিলিয়ে গেল আরও একটা সপ্তাহ পরে। শহরের বন্দিদশা থেকে পরিত্রাণের এমন মতলব আগে কেন মাথায় আসেনি, ভেবে আক্ষেপের অন্ত রইল না দুজনেরই। মুক্তি। মুক্তি! উদার আকাশের তলায় প্রাচীন ও পরিত্যক্ত পল্লি এবং নগরীর মধ্যে অনাবিল স্বাধীনতার আনন্দ-কল্পনায় মশগুল হয়ে রইল দুজনে।

তারপর একদিন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একটি প্রত্যূষে দেখা গেল, উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চে ডেনটনের জায়গায় কর্তব্যনিরত রয়েছে আর-একজন সামান্য কর্মচারী।

গোপনে বিয়েটা সেরে নিয়েছে ডেনটন আর এলিজাবেথিটা। পূর্বপুরুষদের মতোই মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে রওনা হয়েছে পল্লি প্রকৃতির শ্যামলিমার সন্ধানে। এলিজাবেথিটার পরনে আগেকার আমলের সাদা বিয়ের পোশাক। ডেনটন পরেছে বেগুনি রঙের ঢোলা বেশ–পিঠে চামড়ার ফিতেয় বাঁধা খাবারদাবার–কোমরে আলখাল্লার তলায় স্টিলের তরবারি। শেষোক্ত বস্তুটা বহন করছে লাজরক্তিম মুখে।

কল্পনা করুন তো দেখি ওদের পাড়াগাঁ অভিমুখে যাওয়ার ছবিটা! ভিক্টোরীয় আমলের দিগন্তবিস্তৃত শহরতলি আর জঘন্য পথঘাট কোথায়? পুঁচকে বাড়ি, নির্বোধপ্রতিম খুদে বাগান, গোপনীয়তা রক্ষার নিষ্ফল প্রয়াস তিরোহিত হয়েছে কোনকালে। নবযুগের আকাশচুম্বী সৌধশ্রেণি, যান্ত্রিক পথঘাট, বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা–সবই আচম্বিতে শেষ হয়েছে চারশো ফুট উঁচু পর্বত প্রাচীরের মতো খাড়াই দেওয়ালের সামনে। শহর ঘিরে রয়েছে ফুড কোম্পানির গাজর, শালগম, ওলকপির খেত। হাজার রকমের বিচিত্র খাদ্যসম্ভার প্রস্তুত হচ্ছে তো এইসব সবজি থেকেই। ঝোপঝাড়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। কোথাও? নির্মূল হয়েছে সামান্য কাঁটাঝোঁপ আর বুনো ফুলের গাছও। প্রাচীনকালে যা ছিল পরম উৎপাত, ফুড কোম্পানি তার অবসান ঘটিয়েছে চিরতরে। বছরের পর বছর বর্বর প্রথায় ঝোঁপঝাড় গজিয়ে যেত খেতখামারে–এখন আর তা হয় না। ফলে, উৎপাদন বেড়েছে, বাজে খরচ কমেছে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছেন আপেল এবং অন্যান্য ফলভারে অনবত বৃক্ষ। এ ছাড়াও রয়েছে বিশালকায় কৃষিযন্ত্র, জলনিরোধক ছাউনির তলায়। আয়তাকার খালের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে খেতের জল। মাঝে মাঝে উঁচু জায়গাগুলোয় আবর্জনা পচিয়ে নির্গন্ধ সার সরবরাহ করা হচ্ছে আশপাশের খেতে।

প্রকাণ্ড শহর প্রাচীরের বিশাল ধনুকাকৃতি তোরণের সামনে থেকে বেরিয়েছে এন্ডহ্যামাইট সড়ক–গেছে পোর্টসমাউথ পর্যন্ত। ভোরের সোনা-রোদে দেখা যাচ্ছে নীল কোর্তা-পরা ফুড কোম্পানির পরিচারকদের–পিলপিল করে চলেছে পথ বেয়ে সূর্য না ডোবা পর্যন্ত গতর খাটাতে। ধাবমান এই জনতার পাশে বিন্দুবৎ চলেছে ওরা দুজনে, নজরই পড়ে না সেদিকে। সড়কের দুপাশের কিনারা বরাবর গোঁ গোঁ গরগর ঘড়ঘড় শব্দে ধেয়ে যাচ্ছে মান্ধাতার আমলের বাতিল মোটরগাড়ি–শহর সীমানা থেকে বিশ মাইল চৌহদ্দি পর্যন্ত

এদের ডিউটি। তার ভেতরদিককার পথ দিয়ে ছুটছে হরেকরকম যন্ত্রযান; দ্রুতগামী মনোসাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অগুনতি আরোহী, পাশে পাশে ধেয়ে যাচ্ছে। হিলহিলে চেহারার মাল্টি-সাইকেল আর বিস্তর বোঝা নিয়ে চার চাকার সাইকেল, চলেছে দানবাকৃতি মাল-বওয়া শকট–এখন শূন্য, কিন্তু সন্ধ্যা সমাগমে ফিরবে খেতের মালবোঝাই হয়ে। ইঞ্জিনের ধুকধুক শব্দ, হর্ন আর ভেঁপুর মিলিত ঐকতানে মুখরিত সড়কের ওপর দিয়ে বনবন করে ঘুরে চলেছে অগুনতি চক্র–নিঃশব্দে।

নিঃশব্দে চলেছে প্রেমিকযুগলও সড়কের কিনারা বরাবর। নতুন বর-বউ তো, তাই লজ্জা ঘিরে রয়েছে দুজনকেই। শকটারোহীরা গগনবিদারী চিৎকার ছেড়ে যাচ্ছে দুই পথচারীকে উদ্দেশ্য করে–কেন-না ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ সড়কে মোটরগাড়ি যেমন একটা বিরল দৃশ্য, ২১০০ খ্রিস্টাব্দে পায়ে হেঁটে যাওয়াটাও সমান বিরল দৃশ্য। ওদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনওদিকে। স্থির চাহনি নিবদ্ধ সামনের পল্লি প্রকৃতির দিকে–কানে তুলছে না কোনও চিৎকারই।

সামনেই ঢালু হয়ে উঠে গেছে জমি–প্রথমে নীলাভ, তারপর সবুজে সবুজ। দানবাকার হাওয়াকলের চাকার পর চাকা দেখা যাচ্ছে দূরের বাড়ির ছাদে ছাদে। ভোরের টানা লম্বা ছায়ায় গা মিলিয়ে ছুটে চলেছে ভ্যানগাড়িগুলো। দুপুর নাগাদ দেখা গেল, ধূসর বিন্দুর মতো চরে বেড়াচ্ছে ফুড কোম্পানির মাংস বিভাগের ভেড়ার পাল। আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর পেরিয়ে এল কাদামাটি, ফসল-কাটা শেকড়সর্বস্ব খেতের মাঠ এবং কাঁটাঝোপের একটিমাত্র বেড়া। বাস, বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ভয় আর রইল না। রাস্তা ছেড়ে সবুজ মাঠে নেমে এখন নির্বিঘ্নে রওনা হওয়া যাবে পাহাড়তলি অঞ্চলে।

পাণ্ডববর্জিত এহেন অঞ্চলে এই প্রথম ওদের আগমন।

খিদেয় পেট চুঁইছুঁই করছে দুজনেরই। ফোঁসকা পড়েছে পায়ে। হাঁটাটাও তো একটা ব্যায়াম–এ ব্যায়ামের সুযোগ তো ঘটে না যন্ত্রযুগের এই সভ্যতায়। ক্ষণকাল পরেই তাই দুজনে বসে পড়ে ঝোঁপঝাড়হীন ঘোট-করে-কাটা ঘাসজমির ওপর। এবং সেই প্রথম তাকায় পেছনে ফেলে-আসা শহরের দিকে। টেমস নদীর অববাহিকায় নীলাভ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় দূরবিস্তৃত লন্ডন। ভেড়াদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ কখনও ঘটেনি। এলিজাবেথিটার। প্রথমে একটি সন্ত্রস্তই ছিল। ভয় কেটে গেল ডেনটনের আশ্বাস বচনে। মাথার ওপর সুনীল গগনে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে একটা সাদা-ডানা বিহঙ্গ। আহার-পর্ব সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত কথা সরল না কারওই মুখে। তারপর অর্গলমুক্ত হল জিহ্বা। কলকল করে কত কথাই না বলে গেল ডেনটন। এখন থেকে সুখের সাগরে নিমজ্জিত থাকবে দুজনায়। আরও আগে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল সোনার খাঁচার সুখাবহ বন্দিদশা থেকে। অতীতের রোমান্স মধুর দিনগুলিতে দুদিন আগে ফিরে এলে খামকা এত দুর্ভোগ তো পোহাতে হত না। বলতে বলতে ঘাসজমির ওপর রাখা তরবারি তুলে নিয়েছিল ডেনটন। শানিত ফলার ওপর কম্পিত আঙুল বুলিয়ে নিয়ে এলিজাবেথিটা জানতে চেয়েছিল–বরবাদ এই হাতিয়ার হেনে শত্রু কুপোকাত করতে পারবে তো ডেনটন? প্রয়োজন হলে তা-ই করতে হবে বইকী–বলেছিল ডেনটন। কিন্তু রক্তপাত তো ঘটবে–শিউরে উঠেছিল এলিজাবেথিটা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে দুজনে রওনা হয়েছিল পাহাড় অভিমুখে। পথে পড়ল একপাল ভেড়া। ভেড়া কখনও দেখেনি এলিজাবেথিটা। নিরীহ এই প্রাণীগুলিকে হত্যা করা হয়। উদরপূর্তির জন্যে–ভাবতেই কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ে। দূরে শোনা যায় ভেড়া-সামলানো

কুকুরের ডাক। হাওয়াকলের খুঁটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে একজন মেষপালক। হেঁকে জানতে চায়, যাওয়া হচ্ছে কোথায়।

আমতা আমতা করে ডেনটন জানায়, যাওয়া হচ্ছে একটা নিরালা বাড়ির খোঁজে দুজনে থাকবে সেখানে। যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মেষপালক কিন্তু চেয়ে থাকে চোখ বড় বড় করে। বিশ্বাস হয়নি কথাটা।

নিশ্চয় কোনও কুকর্ম করে এসেছ?

একেবারেই না। শহরে থাকার আর ইচ্ছে নেই–তাই এসেছি, ঝটিতি জবাব দেয় ডেনটন।

আরও অবিশ্বাস প্রকটিত হয় মেষপালকের দুই চোখে–কিন্তু এখানে তো থাকতে পারবে না।

দেখাই যাক-না চেষ্টা করে।

পর্যায়ক্রমে দুজনের মুখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে মেষপালক, কালই ফিরে যেয়ে শহরে। দিব্যি গেলে বল তো বাপু, কী কুকর্মটি করে এসেছ? পুলিশ কিন্তু আমাদের ভালো চোখে দেখে না।

চোখে চোখ রেখে বলে ডেনটন, শহরে থাকতে গেলে পয়সা দরকার–আমাদের তা নেই। নীল ক্যাম্বিস পরে কুলিগিরি করাও আমাদের ধাতে সইবে না। চাই সাদাসিধেভাবে থাকতে–সেকেলে মানুষদের মতো।

মেষপালক যে চিন্তাশীল মানুষ, তা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। গাল ভরতি দাড়ি। এলিজাবেথিটার নরম ধাঁচের আকৃতির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে শুধু বললে, তাদের মনেও তো ঘোরপ্যাঁচ ছিল না।

আমাদেরও নেই।

হাসল মেষপালক। বলে দিলে বহু দূরের এক পরিত্যক্ত গ্রামের নিশানা। আগে যে লোকালয়ের নাম ছিল এপসম, এখন সেখানে মাটির টিপি–ইটগুলো পর্যন্ত লোপাট করে নিয়ে গিয়ে ভেড়ার খোঁয়াড় তৈরি হয়েছে। এই টিপির পাশ দিয়ে গেলে পড়বে আর-একটা মাটির ঢিপি–অতীতে সেখানে ছিল লেদারহেড লোকালয়। পাহাড়ের পাশ দিয়ে, উপত্যকা পেরিয়ে, বিচবৃক্ষের জঙ্গলের কিনারা বরাবর গেলে পাওয়া যাবে বুনো ঝোঁপ ভরতি একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখানকার হাওয়াকলের তলা দিয়ে পাথর দিয়ে বাঁধানো দুহাজার বছরের পুরানো একটা রোমান গলি গেছে নদীর পাড় বরাবর। সেইখানে মিলবে বেশ কিছু বাড়ি। কয়েকটার ছাদ এখনও ভেঙে পড়েনি। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু অন্তত পাওয়া যাবে। খুবই শান্ত, খুবই নিরিবিলি জায়গা। কিন্তু রাত ঘনিয়ে এলে জ্বলে না কোনও আলো–ডাকাতরাও নাকি টহল দেয়–অবশ্য শোনা কথা। গল্পকথকদের ফোনোগ্রাফি, প্রমোদ ব্যবসায়ীদের কিনেমাটোগ্রাফ নেই একেবারেই। খিদে পেলে পাওয়া যাবে না খাবার, অসুখ হলে ডাক্তার।

যাওয়ার আগে মেষপালকের ঠিকানা নিয়ে নিল ডেনটন। দরকারমতো খাবারদাবার, জিনিসপত্র কিনে এনে দিতে হবে শহর থেকে।

সন্ধে নাগাদ পরিত্যক্ত গ্রামটায় পৌঁছাল দুজনে। অবাক হল খুদে খুদে অদ্ভুতদর্শন বাড়ি দেখে। সূর্য তখন পাটে বসেছে। সোনা-রোদে নিঝুম হয়ে রয়েছে পুরো তল্লাটটা। খুঁজেপেতে বার করল একটা দেওয়ালহীন বাড়ির এমন একখানা কামরা, যার একধারে ফুটে রয়েছে নীল রঙের একটা বুনো ফুল–চোখ এড়িয়ে গেছে ফুড কোম্পানির ঝোঁপ সাফাই লোকজনদের।

মনের মতো এহেন আস্তানায় কিন্তু বেশিক্ষণ মন টেকেনি দুজনের কারওই। এসেছে প্রকৃতির আলয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখবে বলে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা কি যায়? তাই কিছুক্ষণ পরেই রওনা হয়েছিল পাহাড়ের ওপর। অন্ধকার তখন জমিয়ে বসেছে। ঘরে থাকতেও অসুবিধে। পাহাড়ে উঠে দুচোখ ভরে দেখেছিল আকাশের লক্ষ মানিক, হৃদয় ভরে পান করেছিল নিথর নৈঃশব্দ্য। সেকালের কবিরা কত কবিতাই না রচনা করেছে স্বর্গলোকের এই সুষমা নিয়ে। পাহাড় থেকে নামল সারারাত কাটিয়ে ভোরের আলো ফোঁটার সময়ে। ঘুম হল স্বল্পক্ষণ। ছোট্ট একটা পাখির গানে চোখ রগড়ে উঠে বসল দুজনে।

দিন তিনেক এইভাবেই কাটল যেন রোমান্টিক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। এত সুখ, এত স্বাধীনতা কখনও পায়নি দ্বাবিংশ শতাব্দীর এই দুটি শহরে ছেলেমেয়ে। কিন্তু উত্তেজনা থিতিয়ে এল এক সপ্তাহ পরে–আরও একটা হপ্তা যাওয়ার পরে ঝিমিয়ে পড়ল

একেবারেই। প্রথম প্রথম ঘরকন্নায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ বাড়ি-ও বাড়ি ঘুরে ভাঙা এবং বদখত চেহারার সেকেলে চেয়ার-টেবিল এনে সাজিয়েছিল নিজেদের ভাঙা ঘর। বিছানার গদির জন্যে ভেড়াদের একরাশ ঘাস দুহাত ভরে নিয়ে এসেছিল ডেনটন। অখণ্ড অবসরে হাঁপিয়ে ওঠার পর একদিন কোত্থেকে একটা মরচে-পড়া কোদাল কুড়িয়ে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে মাটি কুপিয়ে ঘেমে-নেয়ে এসে এলিজাবেথিটাকে বলেছিল–সেকালের লোকগুলো অসুর ছিল নাকি? কিন্তু কাঁহাতক এইভাবে একঘেয়েমি কাটিয়ে নতুন নতুন বৈচিত্র আনা যায় এবং একই সুখের কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা এবং শোনা যায়? চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি করেনি ডেনটন। হপ্তা দুয়েক আবহাওয়া ভালো থাকায় তেমন দুর্ভোগও পোহাতে হয়নি। শহর থেকে এতটা পথ হেঁটে আসায় গা-গতরের ব্যথা মরেনি যদিও–বরং বেড়েছে ভাঙা ঘরের খোলা হাওয়ায় রাতের পর রাত কাটিয়ে। শহরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়ে ইস্তক মুক্ত জীবনের এহেন চেহারা তো কখনও তারা দেখেনি। তারপরেই একদিন আকাশ কালো করে ঘনিয়ে এল বৃষ্টির মেঘ। লকলকিয়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। শিউরে উঠেছিল দুজনেই। বিদ্যুতের এ ধরনের ভয়ংকর রূপ কখনও তারা দেখেনি। দৌড়াতে দৌড়াতে নেমে এসেছিল ভাঙা আস্তানায়। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে মুষলধারে বৃষ্টি। ফুটোফাটা ছাদ আর ভাঙা দেওয়াল দিয়ে স্রোতের মতো জলের ধারায় সারারাত ধরে ভিজেছে দুজনে, শীতে কেঁপেছে ঠকঠক করে। ভোররাতে মেঘগর্জন যখন মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে, থেমে গেল বৃষ্টি–শোনা গিয়েছিল নতুন একটা শব্দ।

কুকুরের ডাক। একপাল কুকুর ধেয়ে আসছে এদিকেই। মেষপালকদের কুকুর। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঢুকে পড়েছিল ভাঙা ঘরে। কুকুর কখনও দেখেনি এলিজাবেথিটা। বিশেষ করে এই ধরনের ভয়ংকর সারমেয়। এতক্ষণ কাঁদছিল সারারাত দুর্ভোগ আর ধকলের

মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়। এখন শুরু হল প্রাণ নিয়ে টানাটানি। দাঁত খিঁচিয়ে একটা কুকুর তেড়ে আসতেই তরবারি নিয়ে তাড়া করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল ডেনটন। ছটা কুকুর ঘিরে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। টুটিটুকুতে তখনও কামড় বসেনি–কিন্তু আর দেরিও নেই। জানলা থেকে সেই দৃশ্য দেখে আঠারো বছরের মার্জিত শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত ভুলে গিয়ে এক লাফে দ্বাবিংশ শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর আদিম মানবী হয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথিটা। মরচে-পড়া কোদালটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁকিয়ে খুলি চুরমার করেছিল কয়েকটা কুকুরের–ডেনটনের ধারালো তলোয়ারের কোপে প্রাণ গিয়েছিল আরও কয়েকটার। বাকি কটা প্রাণ নিয়ে লেজ গুটিয়ে দৌড়েছিল মনিবদের কাছে।

কিন্তু এদের মনিব তো ফুড কোম্পানি। এবার তো তারা আসবে–অনধিকার প্রবেশের সাজাও পেতে হবে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল এলিজাবেথিটা। ঢের হয়েছে–রোমান্স গল্পেই মানায়–ধাতে সয় না। এ জীবন তাদের নয়–শহরের জীবনই ভালো।

ডেনটন নিজে থেকেই বলেছিল, শহরেই ফিরে যাওয়া যাক। ফুড কোম্পানির লোকজন এসে পড়ার আগেই। পয়সা? মুখ ফুটে এতদিন বলতে পারেনি বুদ্ধিটা এলিজাবেথিটার মাথাতেই আসা উচিত ছিল। বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছে যে আর তিনটে বছর পরে, সে তো অনায়াসেই ধার করতে পারে এখন থেকেই।

আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল এলিজাবেথিটা। সত্যিই তো, এ বুদ্ধি তো তার মাথায় আগে আসেনি। শহরে থাকতে গেলে দেদার টাকা দরকার–ধার করলেই তো তা পাওয়া যায়! কে না জানে তার মায়ের কুবের সম্পদের কাহিনি!

ঝটপট কিছু খাবার ব্যাগে ভরে নিয়ে দুজনে পালিয়েছিল রোমান্স-পর্বে ইতি ঘটিয়ে দিয়ে–নীল ফুলটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার হারিয়েছিল বলে পাপড়ির গায়ে আলতো চুমু এঁকে দিয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথিটা। এস্তে পলায়ন করেছিল বিশাল সেই শহরের দিকে, যে শহর গিলে বসে আছে মানুষ জাতটাকে।

শহরের জীবন

যেসব আবিষ্কার পৃথিবীর চেহারা পালটে দিয়েছে, তাদের ফিরিস্তিতে সবার আগে রয়েছে পরিবহণব্যবস্থা। যেমন রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি এবং পেটেন্ট রাস্তা। তারপর পরিবর্তনের ঢেউ এল মেহনতি মানুষদের কাজের ধারায়। চাষবাস ছেড়ে কলকারখানায় যোগ দিয়ে ভিড় করল শহরে। সেই সঙ্গে এল নানা রকমের দুর্ভোগ–ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা কল্পনাও করা যায়নি। লোভী হয়ে উঠল মানুষ। গ্রামজীবনের উদারতা মিলিয়ে গিয়ে এল নিষ্ঠুর অর্থগুতা। জুয়ো খেলা, বিলাসিতা এবং অত্যাচারী মনোভাবে ছেয়ে গেল শহরের মানুষের মন। রোগের ডিপো হয়ে উঠল প্রতিটা শহর বেশি লোকের ভিড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

তিন শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল নতুন সমাজের মানুষ। সবার ওপরে ধনিক সম্প্রদায়। সবার নিচে শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এই দুইয়ের মাঝে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুটি মানুষের ভালোবাসা, বিয়ে এবং পল্লি অঞ্চলে সাদাসিধে জীবনযাপন করতে গিয়ে অশেষ দুর্ভোগের কাহিনি বলা হয়েছে আগের অধ্যায়ে। গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে এসে বাবার কাছে গচ্ছিত মায়ের শেয়ারের কাগজের ভিত্তিতে দেদার টাকা ধার করতে আরম্ভ করেছিল এলিজাবেথিটা। ডেনটন তখনও কপর্দকহীন।

চড়া সুদ দিতে হয়েছিল সে জন্যে। কিন্তু নতুন বিয়ের রঙিন মোহে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি দুজনের কেউই। ঘরদোর সাজিয়েছিল নিজেদের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী।

খুঁজেপেতে জোগাড় করেছিল সেকালের ছাপা বই, ভিক্টোরীয় আমলের অদ্ভুত আসবাবপত্র। মিতব্যয়ী থাকার চেষ্টা করেছে গোড়া থেকেই। একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সামাজিক রীতি অনুযায়ী শিশুপালন সংস্থায় না পাঠিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেদের কাছে–সে জন্যে বাড়ি ভাড়া একটু বেশি লাগলেও ভ্রূক্ষেপ করেনি।

এইভাবেই কেটে গেল তিনটে বছর। একুশ বছরে পা দিল এলিজাবেথিটা। শেয়ারের কাগজপত্র বউয়ের নামে হস্তান্তর করার কথা বলতে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মুখ চুন করে ফিরে এল ডেনটন।

দুঃসংবাদটা শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এলিজাবেথিটার। শেয়ারের দাম পড়ে গেছে। চড়া সুদে টাকা ধার করেও ফেঁসেছে দুজনে। শ্বশুরমশায় আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে। হাতে রয়েছে আর মোটে এক হাজার সুবর্ণ লায়ন।

সুতরাং কাজের খোঁজে বেরতে হবে ডেনটনকে। বিপদ তো সেখানেও। উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। এলিজাবেথিটাকে বিয়ে করতে চেয়ে ব্যর্থমনোরথ বিনডন এখন সেখানকার হর্তাকর্তাবিধাতা। কিন্তু লন্ডনের তিন কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের কেউ-না-কেউ নিশ্চয় কাজ দেবে ডেনটনকে।

কিন্তু শহর চষে ফেলেও কাজ পেল না ডেনটন। শেষে এমন অবস্থা এল যে, ওপরতলার দামি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে নেমে আসতে হল দশ-বারোতলা নিচেকার সস্তা ফ্লাটে। এতদিন ধরে জোগাড়-করা মান্ধাতার আমলের শখের জিনিসপত্রও বেচে দিতে হল বুক ফেটে যাওয়া সত্ত্বেও। শেয়ার মার্কেটে ভাগ্যপরীক্ষা করতে গিয়ে হাজার লায়ন থেকে তিনশো

লায়ন খুইয়ে একদিন বাড়ি ফিরল ডেনটন বিপর্যস্ত অবস্থায়। সাত-সাতটা দিন গুম হয়ে কাটাল ফ্ল্যাটের মধ্যে কেঁদেকেটে একসা করল এলিজাবেথিটা। তারপর আবার চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ডেনটন। পেয়েও গেল একটা কাজ। সেলসম্যানের কাজ। চেহারাটা তো ভালো। মেয়েদের টুপি বিক্রি করার দোকানে তাই নামমাত্র মাইনের কাজখানা পেয়ে বর্তে গেল ডেনটন। এতদিন অবশ্য অনেক জায়গায় বড় কাজই খুঁজেছে– কিন্তু মাকাল ফলকে কে দেবে মোটা মাইনের বড় চাকরি?

কিন্তু চাকরি গেল দেড় মাস পরেই–অযোগ্যতার জন্যে। নতুন চাকরির খোঁজে বেরতে হল বেকার ডেনটনকে। কিন্তু তহবিল তদ্দিনে প্রায় শূন্য। মেয়েকে বাধ্য হয়ে দিয়ে আসতে হল শিশুপালন সংস্থায়, ইচ্ছা না থাকলেও। এ যুগের সবাই তা-ই করে। ধনী সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের ভার নেয় সস্তার সংস্থারা। লেবার কোম্পানি শ্রমিক-কর্মচারী জুটিয়ে নেয় এখান থেকেই-বাচ্চারা বড় হয়ে যাবে কোথায়? মানুষ হওয়ার দেনা শোধ করতে হয় বেগার খেটে–আমৃত্যু।

হপ্তা তিনেক পরে ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকি পড়তেই ঘাড়ধাক্কা খেতে হল দুজনকে। জিনিসপত্র কেড়ে নিল হোটেলের মালিক। দারোয়ানের কাছে লেবার কোম্পানির ঠিকানা জেনে নিয়ে বদ্ধপরিকর ডেনটন রওনা হল কুলির কাজেরই খোঁজে এলিজাবেথিটার হাত ধরে।

কিন্তু শিউরে উঠল নারকীয় সেই দৃশ্য দেখে। লন্ডনের রিজেন্ট স্ট্রিটের নাম পালটে হয়েছে নাইনটিন্থ ওয়ে। আটশো ফুট চওড়া। ধাপে ধাপে চলমান মঞ্চ কিনারা থেকে নেমে গেছে মাঝের দিকে। ঘন্টায় পাঁচ মাইল হারে গতিবেগ কমেছে প্রতিটি মঞ্চের। কাজেই ওপরতলার দ্রুতগামী মঞ্চ থেকে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া যায় নিচের তলায়,

মানে একদম মাঝের স্থির পথে। সিঁড়ি বেয়ে নামলেই দুপাশে সারি সারি নিচুতলার বাড়ি, কলকারখানা, বড় বড় আলোক-বিজ্ঞাপন, ফোনোগ্রাফে বিজ্ঞাপনী চিৎকার, কিনেমাটোগ্রাফে বিজ্ঞাপনী বাহার, ক্লাউনের বেশে হতশ্রী নারী এবং পুরুষদের সাজিয়েও বিজ্ঞাপনের বীভৎস কারবার।

দেখেই গা হিম হয়ে গেল এলিজাবেথিটার। মুখ সাদা হয়ে গেল ডেনটনের। তার জন্যেই আজ এলিজাবেথিটার এই দুরবস্থা। এর চাইতে যে বিয়ে না-হওয়াই ছিল ভালো।

ডেনটনের হাত ধরে এলিজাবেথিটা নিয়ে এল উড়ুক্কু যন্ত্রযানের সেই মঞ্চাসনে–পাঁচ বছর আগে যেখানে বসে ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখেছিল দুজনে। নিবিড় কণ্ঠে বললে ডেনটনকে, কেন এত মনস্তাপ? ডেনটনকে বিয়ে করে তো অসুখী নয় এলিজাবেথিটা? দুর্ভোগ এসেছে তো আসুক-না কেন–পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ে যাবে দুজনে।

হাত ধরাধরি করে নেমে এল দুজনে–গেল লেবার কোম্পানির দরজায়।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবেই প্রথমদিকে কাজ করে গেছে লেবার কোম্পানি। যে এসেছে দরজায়, তাকেই দিয়েছে খাদ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর দিনভর কাজের সুযোগ। কোম্পানি গঠনের শর্তই ছিল তা-ই। খাটতে যারা অক্ষম, তাদেরকেও দিতে বাধ্য হয়েছে খাদ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর চিকিৎসা। বিনিময়ে শ্রম-চুক্তি সই করে দিত অক্ষম দুঃস্থরা–সেরে উঠলে গতরে খেটে শোধ করে যেত ঋণ। সই মানে টিপসই। ফোটো তুলে নেওয়া হত সেই সইয়ের। এমনভাবে নথিভুক্ত থাকত পৃথিবীব্যাপী লেবার কোম্পানির বিশ-তিরিশ লক্ষ টিপসই, যে ঘণ্টাখানেক খুঁজলেই বার করে নেওয়া যেত

সইয়ের মালিককে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানায় খাটতে হত এক রোজ–তার জন্যে ছিল উপযুক্ত আইনকানুন। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য একটু বাড়তি দিত লেবার কোম্পানি। খাওয়া-থাকা ছাড়াও কয়েকটা পেনি। কাজে উৎসাহ পেত শ্রমিকরা। ফলে দোলনা থেকে কবরখানা পর্যন্ত ঋণী এবং গোলাম হয়ে থাকত লেবার কোম্পানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মক্কেল।

বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল এই ধরনের ভাবাবেগহীন কার্যকর পন্থায়। পথেঘাটে না খেয়ে কেউ আর মারা যেত না। ভিক্ষুক শ্রেণির বিলোপ ঘটেছিল। লেবার কোম্পানির স্বাস্থ্যকর নীল ক্যাম্বিসের কোর্তার মতো পোশাকও দুনিয়ায় আর কেউ দিতে পারেনি। দেখতে আহামরি না হলেও স্বাস্থ্য, খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসার প্রতীক হয়ে উঠেছিল এই নীল কোর্তা। ফোনোগ্রাফিক নিউজপেপারগুলোয় অষ্টপ্রহর ঢাক পেটানো হত তা-ই নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো পথেঘাটে এখন গাড়িচাপা পড়ে বা না খেয়ে কেউ মরে পড়ে থাকে না।

ওয়েটিং রুমে বসে রইল ডেনটন আর এলিজাবেথিটা ডাক আসার প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষারত বেশির ভাগ কর্মপ্রার্থীই গুম মেরে রয়েছে–দু-চারজন তরুণ ছাড়া। এরা জন্মেছে লেবার কোম্পানির ক্রেশ-এ, মারাও যাবে লেবার কোম্পানির হাসপাতালে, আমৃত্যু দাসখত-লেখা শ্রমিক। বাড়তি কয়েকটা শিলিং হাতে পেয়ে ওড়ায় ঝকমকে পোশাকের পেছনে। মুখে যেন খই ফুটছে। দেমাকে ফেটে মরছে।

ঝিমিয়ে রয়েছে যারা, তাদের ওপরেই এলিজাবেথিটার চোখ পড়ল সবার আগে। এদের মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধা। চোখের জলে ধুয়ে যেতে বসেছে মুখের রং। ছিন্ন মলিন

পোশাক, চোখে খিদের জ্বালা। একজন পাদরিও এসেছে কাজের খোঁজে। ধর্ম নিয়ে ব্যাবসা এখন তুঙ্গে পৌঁছেছে বলেই কারবারে মন্দা যায় ভাগ্যহীনদের ক্ষেত্রে। বিশপমশায়েরও কপাল যে পুড়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে ঘোলাটে চোখ দেখে।

অচিরেই ডেনটন এলিজাবেথিটার ইন্টারভিউ-পর্ব সাঙ্গ হল মহিলা ম্যানেজারের সঙ্গে। দৃপ্তমুখ রুক্ষকণ্ঠ স্ত্রীলোকটির হাবভাবে কথাবার্তায় অপরিসীম তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা। টিপসই নিয়ে নীল কোর্তা পরে সাদামাটা কিন্তু বিশাল খাবার ঘরে পৌঁছাল দুজনে। কদমছাঁট চুল কাটার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়ে গেল নেহাত কপালজোরেই। লেবার কোম্পানিতে বেগার খাটতে এলেই কী নারী, কী পুরুষ–লম্বা চুল কেটে ফেলতে হয় প্রত্যেককেই। জীবনের প্রথম মেহনতি খানা খেয়ে কটুভাষিণী এই ম্যানেজারনির কাছেই ফিরে আসতে হবে কাজের নির্দেশ নিতে।

নীল কোর্তা পরার সময়ে ডেনটনের দিকে ফিরে তাকাতে পারেনি ম্রিয়মাণ এলিজাবেথিটা। তাকিয়ে ছিল কিন্তু ডেটন এবং অবাক হয়ে চেয়ে ছিল পলকহীন চোখে। নীল ক্যাম্বিসের পোশাকেও এত সুন্দরী এলিজাবেথিটা! তারপরেই রেললাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসে ঝোলের বাটি ঝাঁকুনি খেয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে যাওয়ায় চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল ডেনটন–স্রেফ খিদের জ্বালায়! তিন-তিনটে দিন পেটে দানাপানিও যে পড়েনি।

খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বিরসবদনে গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছিল ম্যানেজারনির সামনে। খাওয়ার সময়ে এবং জিরেন নেওয়ার সময়ে কেউ কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারেনি। কথার উৎস যেন শুকিয়ে গেছে।

দাবড়ানি দিয়ে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছিল দুমুখ ম্যানেজারনি। এলিজাবেথিটা একদিন ধাতু পেটাইয়ের কাজ শিখুক–চার পেন্স বোনাস পাবে। ডেনটনকে কাজ শিখতে হবে ফোটো কোম্পানিতে–বোনাস তিন পেন্স।

ডেনটনের ভাগ্যে জুটল কিন্তু অন্য কাজ। অত্যন্ত জটিল ধরনের জলের চাপে চলা মেশিন চালানোর কাজ। মাথা খাটানোর ব্যাপার আছে বলে ভালোই লাগল ডেনটনের। শহরের সমস্ত নোংরা জল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারশো ফুট উঁচু চৌবাচ্চায় চালান হয় এ যুগে। সারি সারি পাম্প জল ঠেলে তুলে দেয় ওপরে। তারপর নানান পাইপের মধ্যে দিয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়ে লন্ডন শহরের চারদিকের খেতখামারে সার হিসেবে। নোংরা জল আর আবর্জনা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার যুগ আর নেই–জল-দূষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে বিশ্ববাসী। ডেনটন যে মেশিন চালাবে, তা এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডেরই অংশ। মেশিন অবশ্য চলবে নিজেই –মেশিনের দাস হয়ে থাকতে হবে তাকে অন্যমনস্ক হবার জো নেই।

এলিজাবেথিটাকেও ধাতু পিটতে হল না শেষ পর্যন্ত। ধাতুর হরেকরকম প্যাটার্ন সৃষ্টির কাজ পেয়ে বর্তে গেল বেচারি। কারুকাজ-করা ধাতুর টালি দিয়ে ঘরদোর সাজানোর ফ্যাশন ছেয়ে ফেলেছে দ্বাবিংশ শতাব্দী। যান্ত্রিক হলে চলবে না–সে তো যন্ত্রেই হয়ে যায়। প্রাকৃতিক ছাঁদ থাকা চাই। দেখা গেছে এ কাজে মেয়েরা বেশ পোক্ত। মাথা খাঁটিয়ে বার করতে পারে হরেকরকম প্যাটার্ন।

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স কিন্তু এলিজাবেথিটার। অনেক তাজাও বটে। দলের দু-তিনটে মেয়ে তো জন্মাবধি ক্রীতদাসী। বাকি কজনের বয়স হয়েছে। চোখ-মুখ নিস্প্রভ। চুলে পাক ধরেছে। গায়ের রং ফ্যাকাশে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। এলিজাবেথিটাকে দেখে বিস্মিত প্রত্যেকেই।

নিচুতলার জীবনযাপন একটু একটু করে সয়ে গেল ডেনটন-এলিজাবেথিটার। অনেক নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, লাঞ্ছনা গেল মাথার ওপর দিয়ে। এমনকী একটা বড় রকমের শোকও খুব একটা নাড়া দিতে পারল না দুজনের আস্তে আস্তে শীতল হয়ে-আসা অন্তঃকরণকে। মারা গেল দুজনের নয়নের মণি–একমাত্র কন্যা!

পাতাল প্রদেশের বীভৎসতা, নির্যাতন, দুঃসহ দৈনন্দিন জীবনটাই যে সব নয়– একদিন... শুধু একদিনের জন্যে নতুন করে উপলব্ধি করেছিল দুজনে। এলিজাবেথিটা চেয়েছিল আকাশের তলায় গিয়ে উড়ুক্কু যানের সেই মঞ্চে নিচে চেয়ারে বসে থাকতে। তারকাখচিত উদার গগনের পানে তাকিয়ে যান্ত্রিক জীবন থেকে ক্ষণেকের পরিত্রাণ পেতে...

এসেছিল দুজনে। নীরবে বসে ছিল পুরানো সেই চেয়ারে। লক্ষ লক্ষ তারার ঝিকিমিকি দেখে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল–পাতাল দুনিয়াটাই সব নয়–স্বর্গ এখনও আছে... ওই ওপরে।

পাতাল-জীবন

কিন্তু পরিবর্তন আসছিল ধীরে ধীরে নিজেদেরই অগোচরে। একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল দুজনে। যন্ত্র সভ্যতা গ্রাস করে নিচ্ছিল দুজনকে–সইয়ে সইয়ে। অসাড় হৃদয় দিয়ে কেউই তা টের পায়নি। ভেবেছে, এই তো স্বাভাবিক। এরই নাম জীবন।

ডেনটনকে পাঠানো হয়েছিল কারখানায়। সেখানে তাকে কাজ করতে হয়েছে এমন সব সঙ্গীর সঙ্গে, যারা স্বভাবে চোয়াড়ে, আকৃতিতে নরপিশাচ, কথাবার্তায় দুর্বোধ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই নিচের তলার মানুষ আর ওপরের তলার মানুষের মধ্যে কথ্য ভাষায় যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল, তা প্রকটতম হয়েছে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে। মেহনতি মানুষের ভাষা তাই নিতান্তই দুর্বোধ্য ওপরমহলের মার্জিত শিক্ষিত মানুষের কাছে। এতদিন বুদ্ধদেবের মতো বিরাট মেশিনের দাসত্ব করে এসেছে ডেনটন–একাই। কারও সঙ্গে কথা বলতে হয়নি–অসুবিধেটাও টের পায়নি। নতুন কারখানায় এসে অমার্জিত ছোটলোকি ভাষা শুনে ঘৃণায় অবজ্ঞায় সঙ্গীদের বয়কট করে একা একা থাকার মতলব করতেই লাগল বিরোধ। খানদানি সঙ্গী ডেনটনকে কোণঠাসা করে ফেলল চোয়াড়ে বৃষস্কন্ধ শ্রমিকরা। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াও বাধিয়ে বসল। কদর্য রুটি গেলাবেই তাকে–ডেনটনের প্রবৃত্তি নেই। খাওয়ার। মুখে ঠুসে দিতে আসতেই রুখে দাঁড়িয়েছিল ডেনটন। প্রথমজনকে প্রহার করতেই প্রহৃত হল নিজেই। ঠোঁট কেটে গেল, চোখে কালশিটে পড়ে গেল এবং জ্ঞান হারিয়ে ছাইয়ের গাদায় লুটিয়ে রইল অনেকক্ষণ। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আবার শুরু হয়ে যেত প্রহার-পর্ব এবং প্রাণটাও খতম হয়ে যেত তৎক্ষণাৎ, যদি না সদয়-হৃদয় এক শ্রমিক আড়াল করে দাঁড়াত তাকে। তারই কৃপায়

একটু একটু করে শিখল হাতাহাতি লড়াইয়ের কৌশল। এ কৌশল সে জানে না বলেই তো বেধড়ক মার খেতে হয়েছে। পাতাল কারখানায়। মার্জিত রুচিবান ডেনটন সাগ্রহে শিখেছিল নিচুতলার মানুষদের টিকে থাকার প্রক্রিয়া। মনে হয়েছে, এই তো জীবন! আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এসেছে ওপরতলার স্মৃতি। স্বরেস, বিনডন–সবাই ফিকে হয়ে গেছে স্মৃতিপট থেকে। তারপর একদিন। লড়াইয়ে পোক্ত হয়ে এসে একাই লড়ে গিয়েছিল কারখানার কুলিদের সঙ্গে। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে রাত্রে শুয়ে এলিজাবেথিটার কাছে সোৎসাহে যখন বর্ণনা করছে তার নীচ জীবনের ইতর কাহিনি, তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল এলিজাবেথিটা। ইদানীং ওদের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথা বলার মতো উষ্ণতা ছিল না মনের মধ্যে। জড়, নিস্পৃহ যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল দুটি প্রাণচঞ্চল মানুষ–যন্ত্রের ক্রীতদাস দুটি যন্ত্র। কিন্তু ডেনটনের রূপান্তর দেখে এলিজাবেথিটা আর সামলাতে পারেনি নিজেকে। সে-ও তো পালটে যাচ্ছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে, অন্য মেয়ে-শ্রমিকদের মধ্যে নিজেকে আর দলছাড়া বলে মনে করতে পারছে না। এ জীবন তো সে চায়নি। এতদিন ডেনটন যা বলেছে, তা-ই বিশ্বাস করেছে–মেনে নিয়েছে। কিন্তু এখন এলিজাবেথিটা বুঝতে শিখেছে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নরক তাদের জন্যে নয়–ওপরতলার জীবনটাই ফিরে পেতে চাইছে মনেপ্রাণে। আহ্বানও এসেছে ওপরতলা থেকে। ডেনটনকে ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ...

থ হয়ে বসে রইল ডেনটন!

বিনডনের হস্তক্ষেপ

বিচিত্র পন্থায় ডেনটনের ওপর প্রতিশোধ নিল বিনডন।

বিচিত্র তার চরিত্র। আশ্চর্য এই কাহিনির মধ্যে প্রহেলিকা বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা বিনডেনের চরিত্র।

ছেলেবেলা থেকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে ধাপে ধাপে সে উঠেছে কর্তৃত্বের শিখরে। ফাটকাবাজি করে পয়সা কামিয়েছে দেদার। বাকি জীবনটা বুদ্ধি খরচ করে কেবল জুয়ো নিয়েই মেতে থেকেছে। নামযশের মোহে ব্যাবসায় নেমেছে। পৃথিবীর সমস্ত উড়ুক্কু যান এসে নামে লন্ডনের যে ফ্লায়িং স্টেজে, সেই কোম্পানির শেয়ার কিনে নিয়ে কোম্পানির সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে। দশজনের সামনে মান্যগণ্য হওয়ার পর নিমগ্ন থেকেছে নিজস্ব একান্ত গোপনীয় সাধ-আহ্লাদ নিয়ে।

চেহারাটা তার চিরকালই অ-সুন্দর। খর্বকায়, অস্থিসার এবং কৃষ্ণকায়। সূক্ষ্ম মুখাবয়বে কখনও প্রকট হয় ধীশক্তি, কখনও আত্মসন্তুষ্টি। যুগের ফ্যাশন অনুযায়ী পোশাকের রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে চুলের রং পালটে যায় যখন-তখন। কখনও পরে বাতাস ভরতি পোশাক, কখনও বিচিত্র টুপি, কখনও কালো সাটিনের টাইট ধরাচূড়া, কখনও চীনে রেশমের আলখাল্লা ঝুলতে থাকে বাতাস-চওড়া কাঁধের পোশাক থেকে। এলিজাবেথিটার মন জয় করার বাসনা নিয়ে পরেছিল গোলাপি রঙের আঁটসাঁট জামা, মাথায় এঁটেছিল জোড়া শিং, সারা গায়ে রকমারি আঁচিল। অপদার্থ ডেনটনের প্রেমে মজে না থাকলে

এলিজাবেথিটা আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। ওর বাবাও তা-ই বলেছিল। এমন খাসা পোশাক দেখেই না মুন্ডু ঘুরে যায় দ্বাবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের! চলতে-ফিরতে রং পালটে যেত অপূর্ব জামাকাপড়ের, মেয়েদের চক্ষু চড়কগাছ না হয়ে পারে? কিন্তু হিপনোটিজমঘটিত অঘটনের পর দেখা গেল ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

বেপরোয়া জীবনযাপন করে যকৃৎ এবং স্নায়ুর দফারফা করে এনেছিল বিনডন। শরীর যখন বিধ্বস্ত, তখন খেয়াল হয়েছিল, বিয়ে-থা করে ঘরকন্নার মধ্যে ঢুকে পড়লে হয়তো স্বভাব পালটে সুস্থ শরীরে টিকে থাকা যাবে আরও কিছুদিন। কিন্তু মনের মতো পাত্রী পাওয়াই তো মুশকিল। ষোলো বছর বয়স থেকেই হরদম প্রেমে পড়েও সত্যিকারের প্রেমে কখনও পড়েনি বিনডন।

পড়ল, এলিজাবেথিটাকে যখন তার বাবা এনে হাজির করল তার সামনে–অবশ্যই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। প্রথম দর্শনেই প্রেমে হাবুডুবু খেল বিনডন–এ প্রেম নিখাদ প্রেম, নিকষিত হেম! এলিজাবেথিটার মনের মানুষ হওয়ার উৎসাহে শেলি আর গ্যেটের জগাখিচুড়ি মুখস্থ করে নিয়ে গেল দিনের পর দিন।

এলিজাবেথিটার মনের মানুষ যে আসলে আর-একজন, বিনডন তার কোনও খবরই রাখত না। এমনকী উচ্চাভিলাষী কুটিল-মস্তিষ্ক স্বরেস যে হিপনোটাইজ করে রেখেছে। মেয়েকে–তা-ও জানত না। এলিজাবেথিটার শান্ত সুমিষ্ট ব্যবহারে ভেবেছে, সার্থক হয়েছে প্রচেষ্টা। দামি দামি গয়না আর প্রসাধনসামগ্রী উপহার দিয়ে গেছে দিনের পর দিন। তারপরেই একদিন উধাও হয়ে গেল এলিজাবেথিটা।

বিনডনের আকাশচুম্বী আত্মশ্লাঘা ধূলিসাৎ হল নিমেষে। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমেই একহাত নিল স্বরেসকে। যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমান করার পর শহরময় চরকিপাক দিয়ে বারোটা বাজিয়ে ছাড়ল স্বরেসের। মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের দিন কেনার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে পথে বসল উচ্চাভিলাষী স্বরেস।

নিখুঁতভাবে কাজটা সমাধান করে যৌবনকালের মদ্যশালায় খুশি খুশি মনে গিয়ে বসল বিনডন। পুরানো দোস্তও জুটে গেল জনা দুয়েক। না, সঙ্গিনী সে জোটায়নি। মেয়ে জাতটার ওপরেই যে হাড়পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল বিনডনের।

ফল যা হবার হল পরের দিন সকালে। যকৃতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিল ফোনোগ্রাফিক মেশিন, বরখাস্ত করল প্রধান পরিচারককে এবং ঠিক করল, প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিতে হবে এলিজাবেথিটা আর ডেনটনের ওপর। প্ল্যানটাও ছকে ফেলল মাথার মধ্যে।

গেল স্বরেসের কাছে। পথের ফকির হয়ে স্বরেস তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে। বিত্ত উদ্ধারের জন্য চিত্ত বিক্রয়ে প্রস্তুত যে কোনও দামে। মায়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হবে এলিজাবেথিটাকে? হাতে পয়সা না থাকলেই লেবার কোম্পানিতে চাকরি নেবে দুজনে? তারপর? তারপর? তারপর আর কী! অনটনের সংসারে ঝগড়া লাগবে দুজনে– বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে এলিজাবেথিটাকে ঘরে এনে তুলবে বিনডন।

কাজ হল প্ল্যাননমাফিক–অক্ষরে অক্ষরে–অন্তত প্ল্যানের প্রথম অংশটা।

লেবার কোম্পানির দরজার সামনেই উঁচুতলার ফ্ল্যাট থেকে বিনডন দেখল সেই দৃশ্য নীল ক্যাম্বিস পরতে চলেছে অনাহারে শুষ্ক এলিজাবেথিটা আর ডেনটন।

তৎক্ষণাৎ তলব পড়ল স্বরেসের। এবার চলুক মানসিক নির্যাতন। এলিজাবেথিটা যেন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে–ডেনটন তার উপযুক্ত নয়।

ইতিমধ্যে ওদের একমাত্র মেয়ে অক্কা পাওয়ায় সে কী ফুর্তি বিনডনের। টাকায় কী না হয়। টাকার জোরেই অঘটন ঘটিয়ে চলেছে সে পরের পর। এবার শেষ পর্ব!

স্বরেস যাক এলিজাবেথিটার কাছে–অপদার্থ ডেনটনকে পরিত্যাগ করার প্রস্তাব নিয়ে।

সুড়সুড় করে হুকুম তামিল করল স্বরেস!

তারপর?

রিপোর্ট দিয়ে গেল স্বরেস। বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব শুনে নাকি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে এলিজাবেথিটা। হাউহাউ করে বলে গেছে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি।

আহা! আহা! বলতে বলতে অকস্মাৎ ককিয়ে উঠেছিল বিনডন। যকৃতের সেই যন্ত্রণাটা ছুরির মতো খুঁচিয়ে চলেছে। পরপর দুবার কোনওমতে সইবার পর তৃতীয় খোঁচাটা খেয়েই দৌড়েছিল ডাক্তারের কাছে।

আগাপাশতলা পরীক্ষা করে ডাক্তার জানতে চেয়েছিল, ছেলেপুলে হয়েছে কি বিনডনের? হয়নি তো! তবে আর বাঁধন কীসের! ইউথ্যানাসিয়ার শরণ নেওয়া হোক–এখুনি।

ইউথ্যানাসিয়া! সেটা আবার কী?

স্বেচ্ছামৃত্যু! আর মাত্র তিন দিন আয়ু আছে বিনডনের। সারাজীবন ধরে আত্মহত্যাই করে এসেছে–এবার তা ত্বরান্বিত হোক তিন দিনের মধ্যে! দুনিয়ার কোনও ডাক্তারই পারবে না তার জীর্ণ দেহযন্ত্রগুলিকে নতুন করে তাজা করতে। আয়ু ফুরিয়েছে। অতএব

ডাক্তারের পিণ্ডি চটকে বিনডন যন্ত্রণায় ককাতে ককাতে শহর চষে ফেলেছিল। বাঘা বাঘা ডাক্তারকে দেখিয়েছিল। কিন্তু সব শেয়ালেরই যে এক ডাক!

আয়ু ফুরিয়েছে বিনডনের। কুবের সম্পদ ঢেলেও আর তা টেনে লম্বা করা যাবে না।

গোল্লায় যাক বিজ্ঞান! নিজের নিভৃত ঘরে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতাটার মুন্ডুপাত করেছিল বিনডন। এলিজাবেথিটা তার মনে দাগা দিয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন মঠে-মন্দিরে ঘুরে শান্তি খুঁজতে গিয়ে যে কথাটা শুনেছিল, মনের মধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হল সেই কথা। এ দুনিয়ায় নশ্বর সবই–জরা এসে একদিন গ্রাস করবেই এই দেহকে। সবই পড়ে থাকবে–অবিনশ্বর শুধু আত্মা–শুদ্ধ রাখ সেই আত্মাকে।

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল বিনডন। এলিজাবেথিটা তাকে ভুল বুঝেছে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বিনডন কী চরিত্রের মানুষ। তার মন জয় করা না গেলেও, মনে ছাপ ফেলে দেওয়া তো যাবে। এমন ছাপ এঁকে যাবে বিনডন, যার পরে অনুতপ্ত হবেই এলিজাবেথিটা –বিনডনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে। চরম উদারতা দেখিয়ে যাবে বিনডন–রিক্তা এলিজাবেথিটাকে এনে বসাবে বিত্তের সিংহাসনে-পাশে থাকবে ডেনটন।

সেই হবে বিনডনের ভয়ানক প্রতিশোধ!

টেলিফোন করল আইনবিদকে তৎক্ষণাৎ। দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল ইষ্টিপত্র –টিপসই চলে গেল তিন মাইল দূরে আইনজ্ঞের দপ্তরে–যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে।

কিছুক্ষণ এলিয়ে বসে থাকার পর রিসিভার তুলে নিয়ে ডাক দিল ইউথ্যানাসিয়া কোম্পানিকে–এত জরুরি তলব কখনও আসেনি এই কোম্পানিতে।...

দিনকয়েক পরে দেখা গেল, তার ফ্ল্যাটে, তার চেয়ারে পাশাপাশি বসে এলিজাবেথিটা আর ডেনটন–দৃষ্টি প্রসারিত সুদূরের আকাশপানে।...